# নদী

শ্রীসুপ্রিয় সেনগুপ্ত

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

# নদী

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত



জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

VICHITRA-VIDYA-GRANTHAMALA
NADI
By Dr. Supriya Sengupta

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮২





প্রকাশক
শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস ( প্রা. ) লি.
১-এ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

পরিবেষক
জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ লি.
১৩৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা ২৯
১-এ ও ৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
সুধেন্দু বাগচী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭/৭ বেণিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

১.১

উৎসর্গ

দাদু, ললিতমোহন গুপ্ত

ও

দিদিমা, কনকলতা দেবীর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

# বিষয়সূচি

# মুখবন্ধ

দুটি ভাগে এ রচনাটি বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে নদীর আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের সাথে সাথে নদী অববাহিকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ছবিটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের নদী সমস্যাকে কেন্দ্র করে। নদী শাসনের ফলে ভাগীরথী-হুগলী ও দামোদর অববাহিকার অধিবাসীরা কি ধরণের সুবিধা অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছেন, তা এই আলোচনার বিষয়বস্তু। আশাকরি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের নদী সমস্যার কারণগুলি পাঠকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ আলোচনায় স্বভাবতই নানা বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করতে হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে যতদূর সম্ভব পরিবেশিত তথ্যের মূলসূত্রগুলি নির্দেশ করেছি। নদী বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকদের জন্য পরিশিষ্টে জলবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান সূত্রগুলিও সন্নিবেশ করা হয়েছে।

স্রোতস্বিনীকে জীবন্ত বলে কল্পনা করতে আমার ভাল লাগে। জীবিত প্রাণীদেহের মতনই নদী প্রবাহের সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরাজ করে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সে ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ করলে তার ফল শুভ হয় না,—এই বোধকে কেন্দ্র করেই এ রচনা। পাঠকের মনে এই বোধকে সঞ্চারিত করতে পারলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

বন্ধুবর শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তীর উৎসাহেই এই পুস্তিকাটি রচিত হল। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুত্বকে ছোট করব না।

১ বৈশাখ ১৩৮৯
কলকাতা

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

প্রথম অধ্যায়

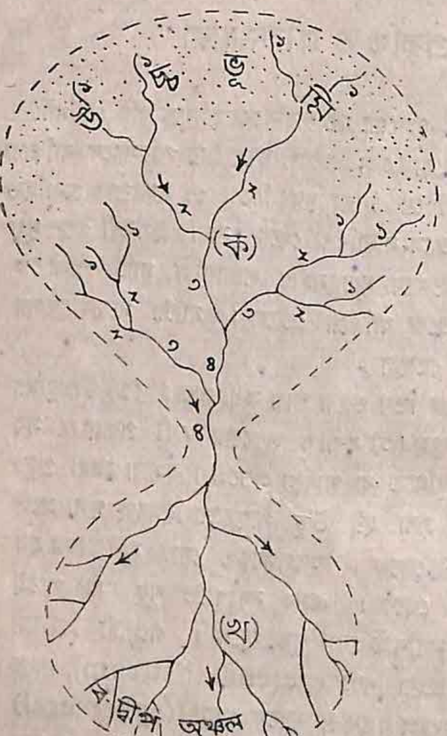
## ১. নদীর প্রকৃতি ও জীবন ধারা

বর্ষার জল মাটিতে পড়ে চাদরের মত চারদিকে ছড়িয়ে যায়। মাটিতে সামান্য ফাঁক পেলেই তার মধ্যে জল প্রবেশ করে তার পরিসরকে বাড়িয়ে তোলে। এই ফাটলের মধ্য দিয়ে নিম্নভূমির দিকে যে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তার থেকেই নদীর জন্ম। ক্রমে নানাদিক থেকে নানা উপনদী এসে মূল নদীকে পুষ্ট করে তোলে। এরই মধ্যে মূল নদীর শাখাগুলি মাটি পাথরকে কেটে কেটে অববাহিকার বিস্তারকে বাড়িয়ে তোলে। মাটির মধ্যে জলের অনুপ্রবেশ ভূমিক্ষয়কে সহজ করে তোলে।

প্রবাহের স্থান অনুসারে নদীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) উচ্চভূমির নদী প্রবাহ (২) সমতলের নদী প্রবাহ (৩) ব-দ্বীপ অঞ্চলের নদী প্রব্যহ। সব নদীরই উৎস অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে বা পার্বত্য অঞ্চলে। সারা বছরই প্রচুর জল থাকে, এ ধরণের নদীর জন্ম হয় উঁচু পাহাড়ের হিমবাহ গলা জলে অথবা খুব বড় আয়তনের হ্রদ থেকে। অপেক্ষাকৃত ছোট নদীর জন্ম হয় উচ্চভূমিতে সঞ্চিত বৃষ্টির জল থেকে। এসব নদীখাতে শুধু বর্ষার পরেই জলপ্রবাহ দেখা যায়, অন্য সময়ে নদীখাত প্রায় শুষ্ক থাকে। গঙ্গোত্রী হিমবাহ উদ্ভূত গঙ্গা একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের নদী (perennial stream), কিন্তু প্রধানতঃ বর্ষার জলের উপর নির্ভরশীল দামোদর নদকে অস্থায়ী (ephemeral) পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এ ছাড়াও কিছু কিছু নদী আছে যাদের খাতে ভূ-জল অনুপ্রবেশের ফলে সারা বছরই মাঝে মাঝে জল প্রবাহিত হয় (intermittent streams)।

যে বিস্তৃত অঞ্চল থেকে জল এসে নদীখাতে মেশে তাকে নদীর অববাহিকা (catchment area) বলে। গাছের দুটি পাতাকে বোঁটায় বোঁটায় জুড়ে দিলে যে রকম চেহারা হয়, সমগ্র নদী অববাহিকার চেহারাটি অনেকটা সেরকম (১নং চিত্র)। বড় পাতাটির মধ্য দিয়ে নানা উপনদীর খাত বেয়ে জলস্রোত মূল নদীতে মিলিত হয় (contributive net)। ছোট পাতাটির মধ্যে নানা খাতে জল বেরিয়ে গিয়ে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে (distributive net)।

অববাহিকার মধ্যে পরিবহণ প্রণালীর ঘনত্ব কত হবে তা নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের শিলাস্তর ও তার গঠনের উপর। কঠিন বালিপাথরের স্তরের চেয়ে নরম মাটি, শ্যেল অথবা চূণা পাথর অঞ্চলে স্রোতস্বিনীর শাখা প্রশাখার সংখ্যা বেশী হয়, কারণ এসব পাথরের উপর জল সমানভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। এসব অঞ্চলে নদীর শাখা প্রশাখার সংখ্যা খুব বেশী হলে তাদের চেহারা হয় গাছের পাতার শিরা উপশিরার মতন (dendritic)। ফাটল বা সন্ধিযুক্ত (jointed) শিলা-স্তরে অবশ্য নদীর শাখা প্রশাখা ফাটলের আকার ধরেই বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে জল সমানভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায় না।

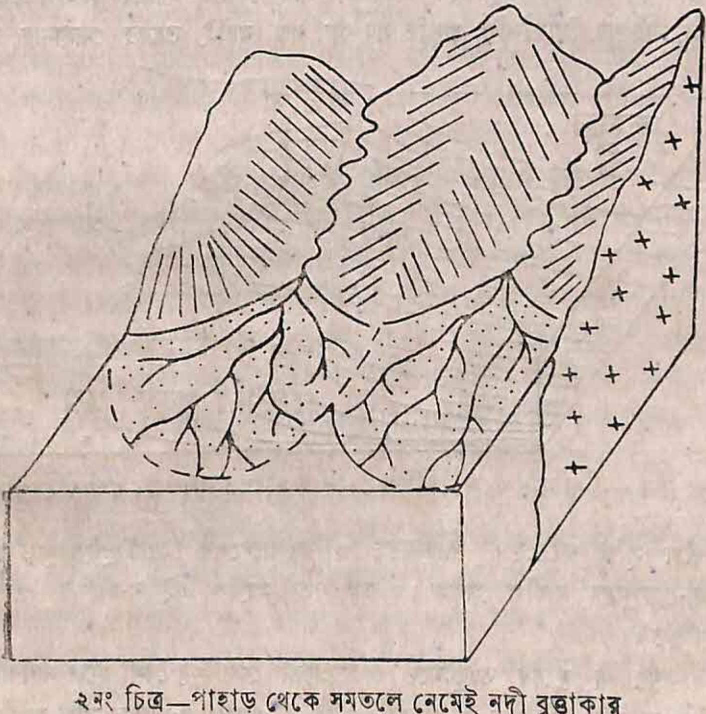



১নং চিত্র। নদী অববাহিকার জ্যামিতিকরূপ
(ক) অববাহিকা (খ) বদ্বীপ অঞ্চল

নদী প্রকৃতির বিশ্লেষণ অথবা দুটি নদী অববাহিকার তুলনামূলক বিচারের জন্য বিজ্ঞানীরা নদীর শাখা প্রশাখা-গুলিকে তাদের মর্যাদা অনুসারে এক একটি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে থাকেন (stream order)। যেসব ছোট ছোট নদী মিলে মূল নদীর উৎপত্তি, তাদের বলা হয় প্রথম পর্য্যায়ের নদী (first order streams)। দুটি প্রথম শ্রেণীর নদী মিলে তৈরী হয় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নদী। দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর মিশ্রণে তৃতীয় পর্য্যায়ের নদী, ইত্যাদি (১নং চিত্রের প্রধান নদীটিতে পর্য্যায় সংখ্যাগুলি দেখান হয়েছে)।

নদীর পর্য্যায় সংখ্যার সঙ্গে নদীর জলপ্রবাহ ও নদী অববাহিকার বিভিন্ন পরিমাপের মধ্যে একটা গাণিতিক সম্পর্ক আছে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—যে নদীর পর্য্যায় সংখ্যা যত বেশী, তার দৈর্ঘ্য, ঢাল, অববাহিকার বিস্তার ও জলপ্রবাহের পরিমাণও তত বড়। ছবিতে চতুর্থ পর্য্যায়ের নদীর দৈর্ঘ্য, ঢাল, অববাহিকার বিস্তার ও জলপ্রবাহের পরিমাণ, ঐ অববাহিকার অন্য সব পর্য্যায়ের নদীর থেকে বেশী।

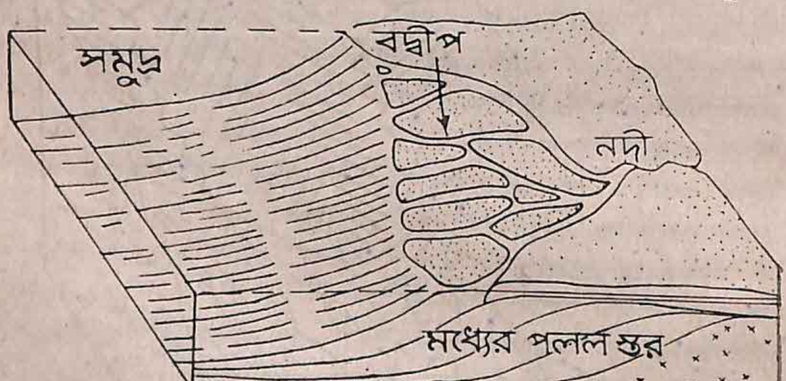
পাহাড়ের গা বেয়ে খরস্রোতা নদী সমতল ভূমিতে প্রবেশ করলে দ্রুত নদীখাতের ঢালের (slope) পরিবর্তন হওয়ায় নদীবাহিত পলি পাহাড়ের সানুদেশে জমা হতে থাকে। এই পললস্তরের আকার হাতপাখার মত ছড়ান হয় বলে একে alluvial fan deposit বলা হয় ( ২নং চিত্র )।



২নং চিত্র—পাহাড় থেকে সমতলে নেমেই নদী বৃত্তাকার পললস্তর (alluvial fan deposit) সৃষ্টি করে।

সমতল ভূমিতে নেমে নদী সাধারণতঃ এঁকে বেঁকে, সাঁপিল গতিতে মোহানার দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যাবার পথে বড় বড় নদী তাদের প্রবাহের দুপাশে বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমির (floodplain) সৃষ্টি করে। প্লাবনভূমিতে জমে ওঠা কাদা মাটির স্তর সাধারণতঃ খুবই উর্বর হয়।

নদী প্রবাহ সাধারণতঃ সমুদ্র বা বড় কোনও হ্রদে গিয়ে শেষ হয়। প্রবহমান জলস্রোত অপেক্ষাকৃত শান্ত জলাধারে মিলিত হলেই জলের বেগ হ্রাস পাওয়ায় নদীবাহিত পলি সেখানে অবক্ষেপিত হতে থাকে। তখন নদী নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে পলিস্তরকে কেটে কেটে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে। শাখানদীগুলির মধ্যবর্তী পলিদ্বীপের চেহারা অনুসারে এদের ব-দ্বীপ (গ্রীক △ অক্ষরের অনুকরণে delta) নাম দেওয়া হয়েছে (৩নং চিত্র)। নীল, নাইজার, মিসিসিপি, প্রভৃতি সব বড় বড় নদীই তাদের মোহানার মুখে




৩নং চিত্র—মানচিত্রে ও অনুদৈর্ঘিক ছেদে ব-দ্বীপের পললস্তর যেমন দেখায়।

ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে আছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অঞ্চল। কলকাতা সহরও এই ব-দ্বীপের প্রান্তেই অবস্থিত।

সমুদ্র বা হ্রদের তটভূমিতে জলস্রোতের বেগ খুব বেশী হলে নদীবাহিত পলি মোহানার মুখে জমা না পড়তেও পারে। এক্ষেত্রে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হবে না। নর্মদা নদীর মোহানায় এ কারণেই ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয় নি। সব ব-দ্বীপের

আকৃতি আবার একই রকম নয়। নাইজার নদীর ব-দ্বীপের চেহারা অনেকটা হাতপাখার মত (fan shaped) দেখতে, কিন্তু মিসিসিপি নদীর ব-দ্বীপ পাখীর পায়ের পাতার মত ছড়ান। ব-দ্বীপের উপর ও নিচের অংশ দুটি (top and bottomsets) মোটামুটি অনুভূমিক (horizontal) পললস্তরে গঠিত হয়। মধ্যের অংশটির চেহারা আনত (inclined), একে বলা হয় foreset। একটি ব-দ্বীপকে লম্বালম্বি ভাবে কেটে ফেললে তার চেহারা কিরকম হয়, ৩নং চিত্রের সামনের অংশ থেকেই তা বোঝা যাবে। এ ধরণের অনুদৈর্ঘিক ছেদে ব-দ্বীপের তিনটি অংশই চেনা যায়।

## নদীর আকৃতি

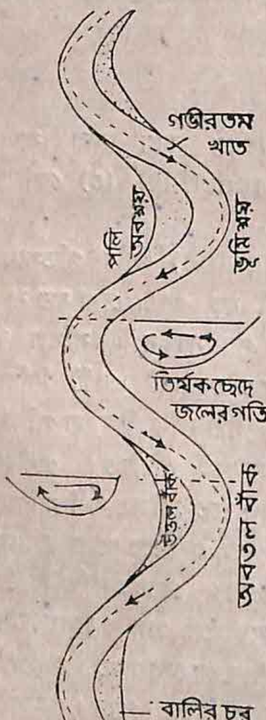
প্রবাহপথের আকৃতি অনুসারে নদীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) সরল (straight) (২) সর্পিল (meandering) (৩) বেণীবদ্ধ (braided)।

মানচিত্রে বা আকাশ চিত্রে (aerial photograph) নদীর গতিপথের আকৃতি সহজেই বোঝা যায়। সরলাকৃতি নদী বড় একটা দেখা যায় না। অনেকের ধারণা যে কিছুদিন প্রবাহিত হবার পর সব নদীই সর্পিল বা বেণীবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সর্পিল আকৃতির নদীতে মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর বাঁক দেখা যায় ( ৪ নং চিত্র )। গঙ্গা নদীর বাঁক, বা পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে ভাগীরথী হুগলীর বাঁকের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। বেণীবদ্ধ আকৃতির নদীতে কয়েকটি দ্বীপের চারদিকে জলস্রোত মিলিত বা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়ে এমন একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, মেয়েদের চুলের বেণীবদ্ধ আকৃতির সঙ্গেই যার তুলনা চলে ( ৫ নং চিত্র )। কোনও নদীর আকৃতি সর্পিল বা বেণীবদ্ধ হবে কিনা তা নির্ভর করে তার ঢাল ও জলপ্রবাহের পরিমাণের উপর। বিশেষ কোনও জলপ্রবাহে নদীখাতের ঢাল সামান্য বাড়লেই একটি সর্পিল আকৃতির নদী বেণীবদ্ধ রূপ ধারণ করতে পারে। আবার কোনও একটি নির্দিষ্ট ঢালে জলস্রোতের পরিমাণ বাড়লেও একই ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাহাড় বা উচ্চভূমি ছেড়ে সমতলে প্রবেশ করলেই দ্রুত ঢালের পরিবর্তনের ফলে পলি অবক্ষেপণ ত্বরান্বিত হওয়ায় নদী

বেণীবদ্ধ রূপ নেয়। তিস্তা প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের নদীখাত বা ব্রহ্মপুত্রের অংশ-বিশেষ এ কারণেই বেণীবদ্ধ।

নদীর গতিপথ সর্পিল হয় কেন ?—এ প্রশ্নটি বহুকাল যাবতই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে এসেছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত মতটি নিয়েই আমরা আলোচনা করব।

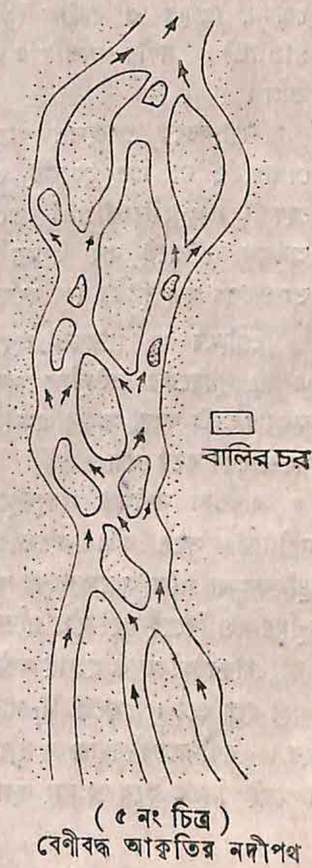
গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সরলাকৃতি কোনও জলস্রোতের বেগ ও পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই জলকণাগুলি পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলে (helical flow)। এর ফলে জলস্রোত নদীর এক দিকের পাড়ে চাপ সৃষ্টি করে সেখানে ভাঙ্গন ধরায়। ভাঙ্গনের ফলে নদীর গভীরতম খাতটি (thalweg) নদী গর্ভকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে, দু'দিকের বাঁক ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রবাহিত হতে থাকে (৪ নং চিত্র)। এর ফলে স্রোতের বাঁকে বাঁকে কেন্দ্রাতিগ বলের (centrifugal force) সৃষ্টি হওয়ায় নদীখাতের বাইরের অংশের জল উত্তাল হয়ে ওঠে। এ সময়ে নদীপাড়ের বালি-কাদা জলস্রোতের মধ্যে ধসে পড়ে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলে বটে, কিন্তু আবর্তের নিচের অংশের বেগ উপরের অংশ থেকে অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্রমে ক্রমে এই পলি নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়তে থাকে। এর ফলে ধসে যাওয়া পাড়ের সামনের বাঁকে একটি বালির চরের সৃষ্টি হয়। এই চরে বাধা পেয়ে স্রোতের মুখ বিপরীত দিকে ঘুরলে নদীর অপর পাড়ে আবার ধসের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে, সমস্ত ঘটনাটির পুনরাবৃত্তিতে সমস্ত নদীপথটিই সর্পিল আকৃতি ধারণ করে।




(৪ নং চিত্র)
সর্পিল আকৃতির নদীপথ

"নদীর এ-পাড় ভাঙ্গে, ও-পাড় গড়ে" বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। এর কারণ উপরের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে। সর্পিল আকৃতিতে প্রবাহিত নদীর অবতল বাঁকে (concave bend) কোনও জনবসতি থাকলে নদীপাড়ের ভাঙ্গনে ক্রমে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। সাথে সাথেই উত্তল বাঁকে (convex bend) পলি অবক্ষেপনের ফলে নূতন চরের আবির্ভাব হবে ( ৪ নং চিত্র )। এই প্রাকৃতিক নিয়মেই অবতল বাঁকের কাছে অবস্থিত বহু প্রাচীন জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, আবার অপর পাড়ে নূতন ভূমি জেগে ওঠায় সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা পদ্মা, মেঘনার পাড় ভাঙ্গা-গড়ার বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর পাড় ভেঙ্গে জনপদ বিলীন হবার কাহিনীও অনেকের জানা আছে। ভাগীরথীর অবতল বাঁকের ধসগুলি ১৬ নং চিত্রে দেখা যাবে।

নদীর জলস্রোত নদীগর্ভে সঞ্চিত পলির বোঝা অপসারণে অসমর্থ হলে নদী ক্রমে ক্রমে বেণীবদ্ধ রূপ ধারণ করতে থাকে। সঞ্চিত পলি প্রথমে নদীখাতের মধ্যে একটি চরের সৃষ্টি করে। এই চরে বাধাপ্রাপ্ত হলে স্রোত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দ্বীপটির দু'দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর ফলে স্রোতের গতিপথ বেঁকে গিয়ে নদীপাড়ে আঘাত করায় ধসের সৃষ্টি হয়। ধসে যাওয়া মাটি ও বালি কিছুদূর পর্য্যন্ত নদীস্রোতে পরিবাহিত হলেও, পরে নদীগর্ভে অবক্ষেপিত হয়ে আবার একটি চরের সৃষ্টি করে। এই চরে বাধা পেয়ে জলস্রোত আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে সমস্ত নদীপথটিই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ও পুনর্মিলিত হয়ে বেণীবদ্ধ রূপ নেয় ( ৫ নং চিত্র )।




( ৫ নং চিত্র )
বেণীবদ্ধ আকৃতির নদীপথ

বিভিন্ন কারণেই নদীর জলস্রোত সঞ্চিত পলির বোঝা অপসারণে অসমর্থ হতে পারে। জলস্রোতের বেগ ও পরিমাণের তুলনায় পলির পরিমাণ বেশী হলে নদী পলি অপসারণে অসমর্থ হয় (incapacity)। আবার স্রোতের তুলনায় বালি কাঁকরের মাপ বড় হলেও নদী পলি অপসারণে অপারগ হতে পারে (incompetency)।

## নদীর জীবন ধারা

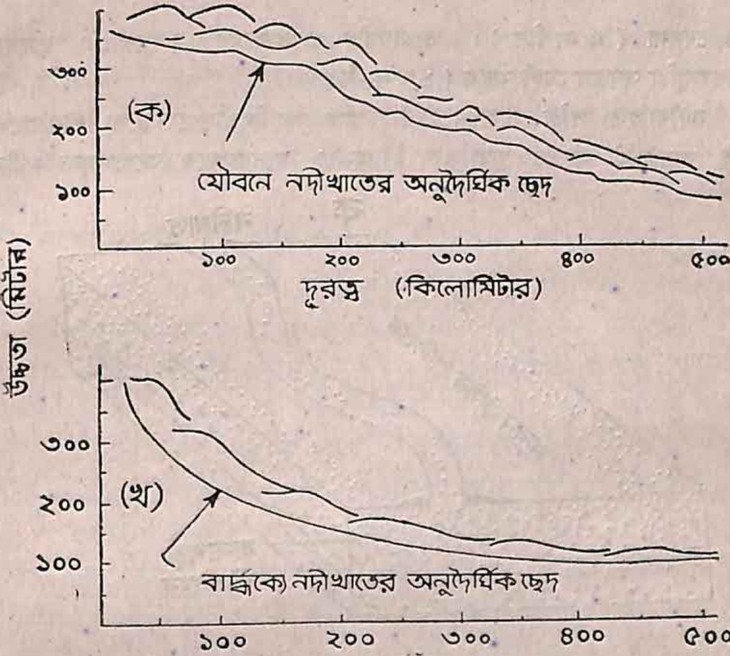
বিজ্ঞানীরা নদীর জীবনকালকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করে থাকেন—যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য (youthful stage, mature stage, old stage)। নদীর কর্মশক্তি ও তার অনুদৈর্ঘিক ছেদের আকৃতি অনুসারেই এই ভাগ।

নদীখাতকে প্রবাহপথ বরাবর লম্বালম্বি ভাবে কেটে ফেললে কি রকম দেখায়, ৬ নং চিত্র থেকেই তা বোঝা যাবে। যৌবনে নদীর এই অনুদৈর্ঘিক ছেদ ( longitudinal profile ) অসমান থাকে ( ৬-ক চিত্র )। এই অসমান নদীগর্ভে বাধা পেয়ে জলরাশি যে শক্তির সৃষ্টি করে তাতে নদীর তলদেশের ক্ষয় দ্রুততর হয়, ফলে নদীগর্ভ মসৃণ হয়ে ওঠে।

প্রৌঢ়ত্বে বা পরিণত অবস্থায় নদীগর্ভের চেহারা হয় আরও মসৃণ। নদী এসময় দু'দিকের তটভূমির ক্ষয়সাধন করে নিজের খাত ও প্লাবনভূমিকে বিস্তৃত করবার চেষ্টা করে, আবার একই সঙ্গে পলি অবক্ষয় ও অবক্ষেপনের মাত্রার মধ্যেও সমতা রক্ষা করে চলে।

বার্দ্ধক্যে নদীগর্ভ সম্পূর্ণরূপে মসৃণ (graded) হয়ে ওঠে ( ৬-খ চিত্র )। নদীগর্ভের সমস্ত বাধা অপসারিত হওয়ায় জলপ্রবাহ দ্রুতগতি হয় বটে, কিন্তু ভূমিক্ষয় বা পলি অবক্ষেপনের শক্তি তার আর থাকে না। নিজের সৃষ্ট প্লাবন ভূমির মধ্য দিয়েই নদী ধীর গতিতে মোহানার দিকে প্রবাহিত হয়।

যৌবন অতিক্রান্ত হলেই নদীগর্ভের বিস্তার বাড়ে ও নদী পাড় দুটির চেহারা খাড়া হয়ে ওঠে। ফলে V-আকৃতির নদীখাত ক্রমে U-অকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। নদীখাতের চেহারা এ সময়ে কিরকম হবে তা যে শুধু নদীর জলস্রোতের উপরেই নির্ভর করে তা নয়, জলবায়ু, উদ্ভিদ, অববাহিকার ভু-সংস্থান প্রভৃতি



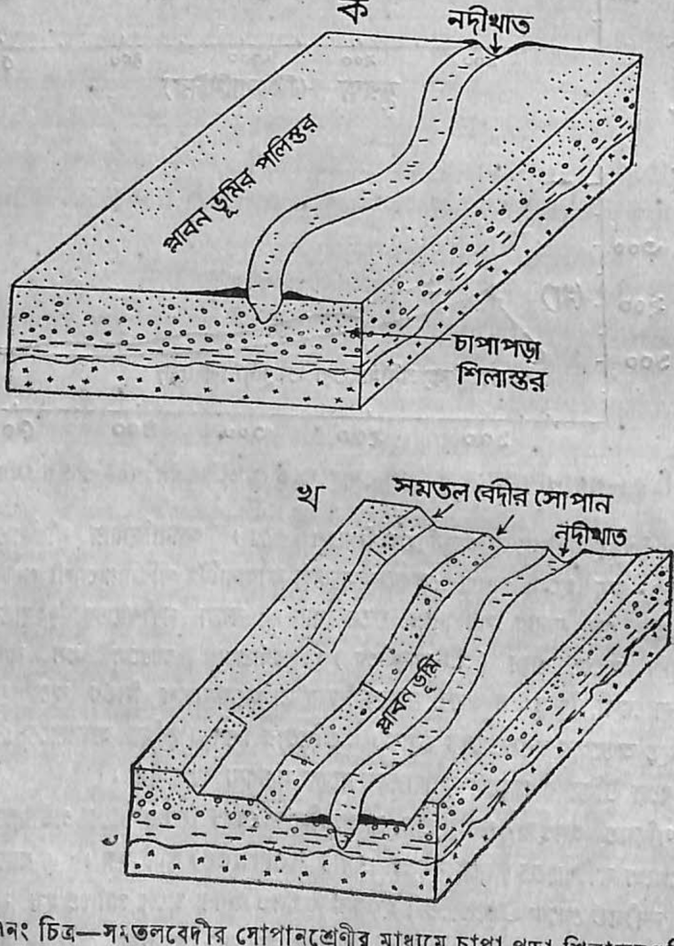

৬নং চিত্র—লম্বালম্বি ভাবে কাটলে যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে নদীখাত যেমন দেখায়

অনেক কিছুই নদীখাতের আকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে অথবা সেখানে অাটাল কাদামাটির পরিমাণ বেশী থাকলে নদীপাড়ে ধস নামার সম্ভাবনাও কমে যায়। ফলে নদীখাতের দুইপাড়ের চেহারাটা থাকে খাড়া ( U-আকৃতির )। বর্ষাপ্রধান অঞ্চলে ধস নামার সম্ভাবনা বেশী, কিন্তু ধস আদৌ নামবে কিনা তা অনেকাংশে নির্ভর করে নদী সন্নিহিত অঞ্চলের বনসম্পদের উপর। উদ্ভিদের শিকড় ভূমির অবক্ষয়কে রোধ করে বলে উদ্ভিদের প্রাচুর্য্যে নদীপাড়ের ধসের সম্ভাবনা কমে যায়।

পরিণত অবস্থায় নদী তার প্লাবনভূমিকে কেটে নিচের দিকে গভীরভাবে বসে গেলে নদীখাতের দুধারে সমতল বেদীর (terrace) সৃষ্টি হয়। এ ধরণের বেদী নদীগর্ভ থেকে উঁচুতে তৈরী হওয়ায় কখনও বন্যার জলে প্লাবিত হয় না। নদী অঞ্চলটি সমান্তরাল শিলাস্তরে গঠিত হলে সমতল বেদীগুলি সোপানশ্রেণীর

মত দেখায় ( ৭ নং চিত্র )। ভাগীরথীর প্রবাহপথের দুপাশে এ ধরণের অনেকগুলি সমতল বেদী আছে ( ১৭ নং চিত্র )।

নদীবাহিত পলি সাধারণতঃ নিচেকার সব শিলাস্তরকে চাপা দিয়ে রাখে, তাই বহুকোটি বছরের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসও অনেকসময়ে অপেক্ষাকৃত নবীন




৭নং চিত্র—সমতলবেদীর সোপানশ্রেণীর মাধ্যমে চাপা পড়া শিলাস্তরগুলি আমাদের গোচরে আসে।

পলিস্তরের নিচে ঢাকা পড়ে যায়। নদীখাত প্লাবনভূমিকে কেটে গভীরভাবে বসে গেলে পলিচাপা নিচেকার শিলাস্তরগুলি সমতলবেদীর সোপানশ্রেনীর মাধ্যমে আবার উদ্ঘাটিত হয়। সেইসঙ্গে বহুকোটি বছরের চাপাপড়া ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসও আবার আমাদের গোচরে আসে ( ৭-খ চিত্র )।

## নদী-অববাহিকার ভারসাম্য

আমরা যেমন মানুষের চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করি, নদী বিজ্ঞানীরা তেমনই নদীর অনুদৈর্ঘিক ছেদের চেহারা থেকে নদীর কর্মক্ষমতা বোঝার চেষ্টা করেন। যৌবনে নদী খরস্রোতা থাকে। এ সময়ে নদীখাত অসমান থাকায় নদীগর্ভে মাটি-পাথরের ক্ষয়ও খুব দ্রুত হয়। পরিণত অবস্থায় নদীগর্ভ মসৃণ হয়ে ওঠার ফলে নদীখাতের পলি অবক্ষয় ও অবক্ষেপনের মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা (steady state) বিরাজ করে। এ-অবস্থায় নদীর আকৃতি, নদীগর্ভের ঢাল, প্রস্থ, তির্যকছেদ, পরিবাহিত পললকণা ও সংস্তরের পলি, সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সহজ সহাবস্থান গড়ে ওঠে। নদীর কোনও অংশে কোনও রকম পরিবর্তন হলে অন্য সমস্ত অংশই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবর্তিত করে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। নদীর এই স্বতঃ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে প্রাণী-দেহের জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কোনও নদীর অনুদৈর্ঘিক ছেদ পর্য্যবেক্ষণ করেই কিন্তু বলা সম্ভব নয় যে নদীখাতে ভারসাম্য বিরাজ করছে কিনা। নদীটি অনেকদিন যাবৎ স্থিতাবস্থায় আছে কিনা সেটাই আগে জানা দরকার।

স্থিতাবস্থা বোঝার একটি উপায় হল নদীতে পলি অনুপ্রবেশ ও নির্গমনের পরিমাণের মধ্যে সমতা বিরাজ করছে কিনা তা মেপে দেখা। নদীতে প্রবাহিত পলির পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়। তাই অনেক সময়ে এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। স্থিতাবস্থা অর্জন করলে নদীগর্ভের নরম পলিস্তরের অবক্ষয় বন্ধ হয়। তাই নদীগর্ভের চেহারা নিরীক্ষণ করেও স্থিতাবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব।

অববাহিকার সমস্ত নদী উপনদীর মধ্যে স্থিতাবস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা একই সঙ্গে চলতে থাকে। জন্মের মূহুর্ত থেকেই নদীর প্রত্যেকটি শাখা তাদের গভীরতা ও বিস্তার বাড়িয়ে চলে, ও সেইসঙ্গে নদীখাতের ঢাল নিয়ন্ত্রণ করে তাকে

মসৃণ করে তোলে। ছোট ছোট উপনদীগুলি জন্মস্থানের ভূমিক্ষয় করতে করতে স্রোতের বিপরীত দিকে তাদের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যায় ( এই প্রক্রিয়াটিকে head water erosion বলা হয়। আবার বড় বড় উপনদীগুলি তাদের ছোট ছোট প্রতিবেশীকে গ্রাস করেও অগ্রসর হয়। এ ভাবেই সমগ্র অববাহিকায় নদী উপনদীগুলির ঢাল, বিস্তার, জলস্রোত ও শাখা প্রশাখার সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার একটা অবিরাম চেষ্টা চলতে থাকে।

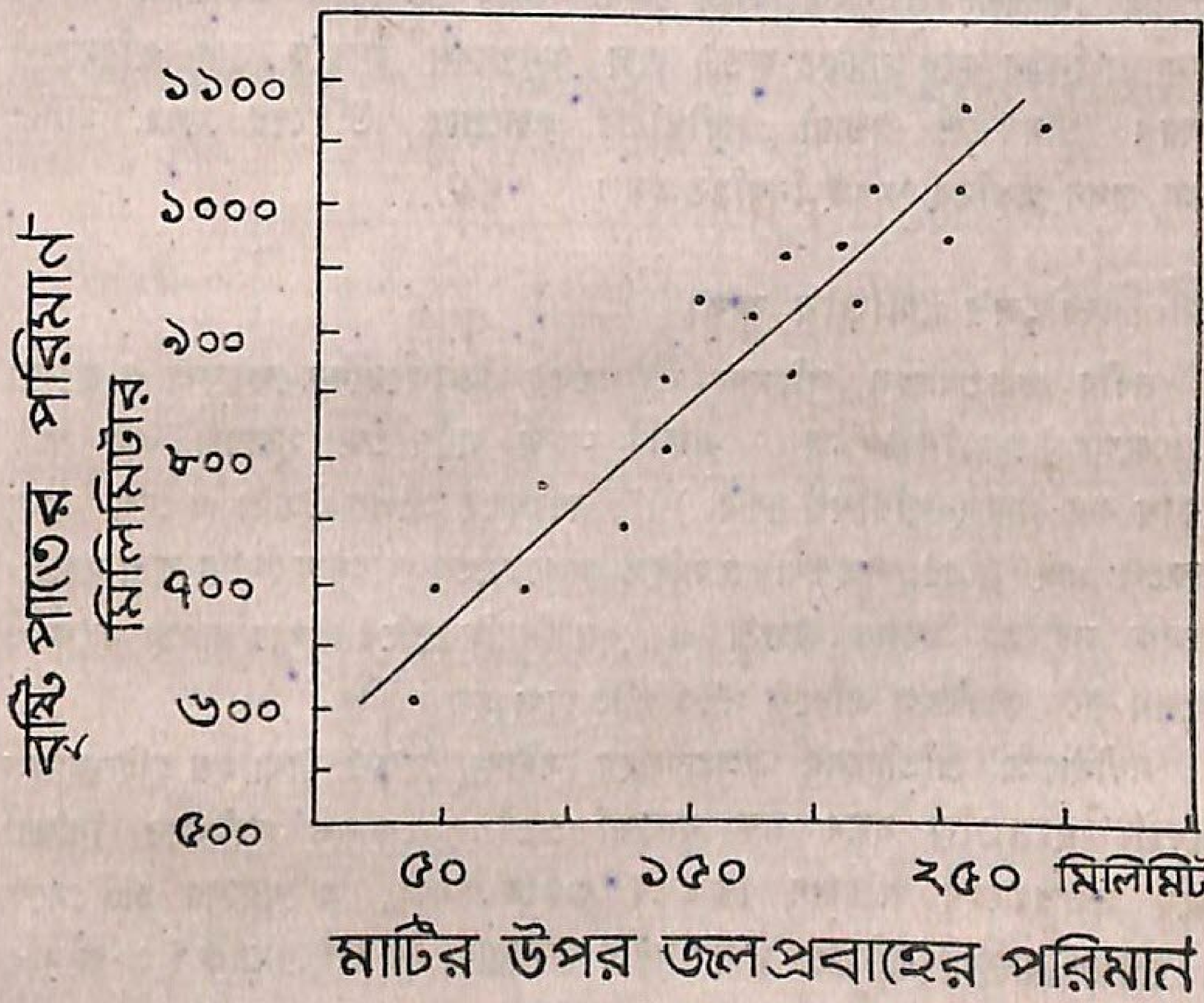
স্বার্থের তাড়নায় মানুষ অনেক সময়েই নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহের উপর হস্তক্ষেপ করে থাকে। বাঁধ দিয়ে নদীর জলপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা, অথবা প্রয়োজনমত কৃত্রিম খালের সাহায্যে নদীপথকে পরিবর্তিত করার প্রচেষ্টা প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। কৃত্রিম উপায়ে নদীর কোনও অংশকে নিয়ন্ত্রিত করার আগে সমগ্র অববাহিকার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের রূপটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার। সমতা নষ্ট হলেই ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার তাড়নায় নদী সংহার মূর্তিতে দেখা দেয়, ফলে সুফলের বদলে দীর্ঘস্থায়ী কুফলের আশঙ্কাই বাড়ে। আমাদের দেশে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যাবৎ নদীপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে একই সঙ্গে বন্যারোধ ও শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা হয়েছে। এধরণের প্রচেষ্টায় অনেক সুফল ফললেও নদী অববাহিকার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির আশঙ্কাও বেড়েছে। দামোদর উপত্যকায় নদী নিয়ন্ত্রণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ কি ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা থেকেই তা সুস্পষ্ট হবে।

## ২. নদীর জল ও পলি প্রবাহ

গ্রীষ্মের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ থেকে স্থলভাগের উপর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জলের খুব সামান্য অংশই সোজাসুজি নদীতে প্রবেশ করে। অনেকটা জলই মাটির উপর ছড়িয়ে পড়ে নানা পথে সমুদ্রে মেশে। জলের এক অংশ মাটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে মাটির নিচ দিয়ে নদীখাতের দিকে ধাবিত হয়; অন্য অংশ ভূ-জলের কলেবর বৃদ্ধি করে। এই ভূ-জলের এক ভাগ আবার মাটির বাইরে এসে ঝরণা ও নদীর মাধ্যমে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র-মেঘ-বৃষ্টি-ভূ-জল-নদী-আবার সমুদ্র—এভাবেই পৃথিবীর জলরাশি আবহমানকাল চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শীতপ্রধান অঞ্চলে অথবা সুউচ্চ পর্বতচূড়ায় বর্ষার জল সোজাসুজি মাটিতে না পড়ে তুষারকণায় রূপান্তরিত হয়ে হিমবাহের মধ্যে সঞ্চিত থাকে! হিমবাহ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে নেমে এলে তুষার গলে গিয়ে যে জলের সৃষ্টি হয় তা থেকেই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের নদীগুলির জন্ম।

স্থলভাগের উপর যে বৃষ্টিপাত হয় মোটামুটি হিসাবে তার মাত্র শতকরা কুড়িভাগ মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বৃষ্টিপাত ও মাটির উপরে প্রবাহিত জলপ্রবাহের পরিমাণের মধ্যে একটি সহজ সম্পর্ক আছে। গ্রাফে সরল রেখার মাধ্যমে এই সম্পর্ক প্রকাশ করা যায় (৮নং চিত্র)। অবশ্য স্থান কাল ভেদে এই সম্পর্কের প্রকারভেদ হয়।




৮নং চিত্র

বৃষ্টির জলের যে অংশ স্থলভাগের উপর প্রবাহিত হয় না, অথবা মাটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না, সে অংশটি বাষ্পীভূত হয়ে যায় অথবা তুষারের আকারে মাটির উপর সঞ্চিত থাকে। বাষ্পীভবন অথবা মাটিতে অনুপ্রবেশ

নিয়ন্ত্রণের কাজে গাছপালার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গাছের পাতার ঘনত্ব খুব বেশী হলে বৃষ্টির জলের খুব সামান্য অংশই সোজাসুজি মাটিতে পড়তে পারে, ফলে মাটির ক্ষয় কম হয়, কিন্তু গাছের সারিতে জমি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় মাটিতে জল জমে বেশী। এই জল গাছের শিকড় ও অন্য ফাটলের পথে চুঁইয়ে মাটির নিচ দিয়ে নদীখাতের দিকে অগ্রসর হয়। উদ্ভিদ ছাড়াও মাটির গঠন (structure), গ্রথন (texture) ও মাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কীট সৃষ্ট গর্ত নানাভাবে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

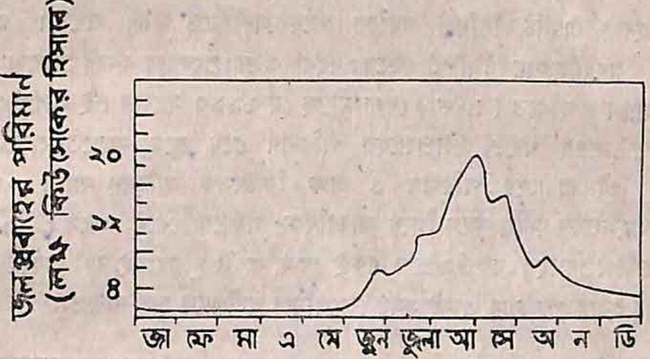
অস্থায়ী নদীগুলির (ephemeral streams) জলপ্রবাহ বর্ষার জলের উপরেই নির্ভরশীল। বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে নদীখাতে জলপ্রবাহ থাকবে কিনা তা নির্ভর করে মাটিতে কতটা জল অনুপ্রবেশ করেছে তার পরিমাণের উপর। গ্রীষ্মকালে অস্থায়ী নদীগুলির জলস্রোত, উদ্ভিদের ঘনত্ব, মাটির গঠন, গ্রথন প্রভৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

## জল বিজ্ঞানের গোড়ার কথা

নদীর জলপ্রবাহের পরিমাণ নদীখাতের তির্যকছেদের ক্ষেত্রফল ও জলের গতিবেগের উপর নির্ভরশীল। একটি সহজ গাণিতিক সূত্রদ্বারা এই সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। নদীখাতে জলের উচ্চতা ও বেগ জানা থাকলে এই সূত্রের সাহায্যে প্রবাহিত জলস্রোতের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। অনেক নদীতেই জলের উচ্চতা ও বেগ নিয়মিতভাবে মাপার ব্যবস্থা থাকে ও বিশেষ করে বর্ষাকালে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

নদীখাতের প্রতিদিনের জলপ্রবাহের সঠিক রেকর্ড রাখা হয় হাইড্রোগ্রাফ (hydrograph) নামে এক ধরণের চার্টে। কোনও নদীখাতে বিভিন্ন সময়ে জলপ্রবাহের পরিমাণ কিভাবে বাড়ছে-কমছে, এ ধরণের চার্ট থেকে তা বোঝা যায়। ছবিতে গঙ্গা নদীর জলপ্রবাহের হাইড্রোগ্রাফ ( ৯-ক ) ও দামোদর নদের বন্যার সময়ের হাইড্রোগ্রাফ ( ৯-খ ) দেখান হয়েছে। কোনও নদী অববাহিকায় বৃষ্টির জলের কতটা অংশ কি হারে মাটির ভিতরে প্রবেশ করছে, আর কতটা অংশ কত সময় অন্তর নদীপথে প্রবাহিত হচ্ছে, হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ করে তাও বলা সম্ভব।

হাইড্রোগ্রাফ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নদীখাতে বন্যা হয় মোটামুটি-

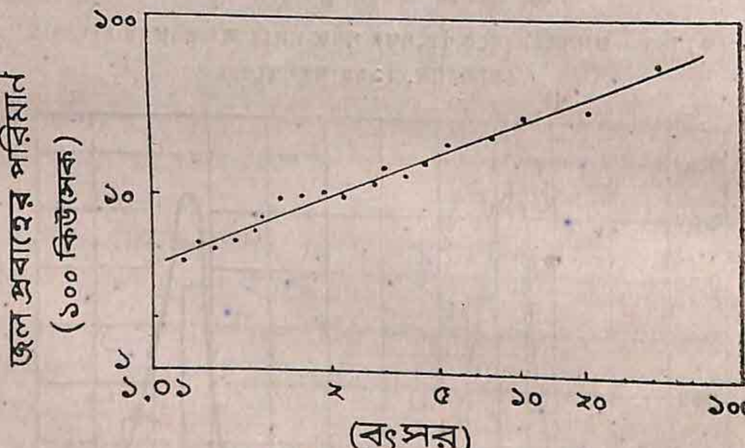



৯ (ক) চিত্র—জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গঙ্গার জলপ্রবাহের হাইড্রোগ্রাফ
( কোলম্যান, ১৯৬৯ অবলম্বনে )




৯ (খ) চিত্র—দামোদর নদের ১৯১৩ ও ১৯৩৫-এর আগষ্ট মাসের বন্যা সংক্রান্ত
হাইড্রোগ্রাফ ( এন, কে, বোস ও এ, কে, সিংহ অবলম্বনে )
( জলপ্রবাহ হাজার কিউসেকের হিসেবে দেখান হয়েছে )

ভাবে নির্দিষ্ট একটি প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। সাধারণতঃ অববাহিকায় বৃষ্টি হবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে নদীখাতে বন্যা আসে। আবার অনেক অববাহিকায় নির্দিষ্ট কয়েকবছর অন্তর প্রবলতর বন্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে ( ৯-ক ) দেখা যাচ্ছে যে ১৯১৩ সালের ৫ই আগষ্ট থেকে দামোদর নদের খাতে জলপ্রবাহের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বাড়তে বাড়তে ৯ই আগষ্ট এই প্রবাহের পরিমাণ ৬ লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যায়। এরপর জলপ্রবাহ আস্তে আস্তে কমে গিয়ে স্বাভাবিক পর্য্যায়ে নেমে আসে। ১৯৩৫ সালের জলপ্রবাহের রেকর্ডও প্রায় একই রকম, অর্থাৎ দু বছরেই নদী অববাহিকায় বর্ষা শুরু হবার পর প্রায় একই সময় লেগেছিল নদীখাতে ঢল নামতে।




১০নং চিত্র

বন্যার পৌনঃপুনিকতার অন্তর (flood recurrence interval) নদীখাতে জলপ্রবাহের পরিমাণের সঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এই সম্পর্কটি ১0নং চিত্রে দেখান হয়েছে। কোনও নদীখাতে বহুদিন যাবত জলপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত থাকলে এ ধরণের গ্রাফ থেকে বন্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ভবিষ্যতবাণী করা চলে। তবে, আবার কবে জলপ্রবাহ

একটি বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে তা মোটামুটি অনুমান করা গেলেও পরবর্তি বন্যা যে ঠিক কবে হবে সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতবাণী করা কখনই সম্ভব নয়।

## জলস্রোতের প্রকৃতি

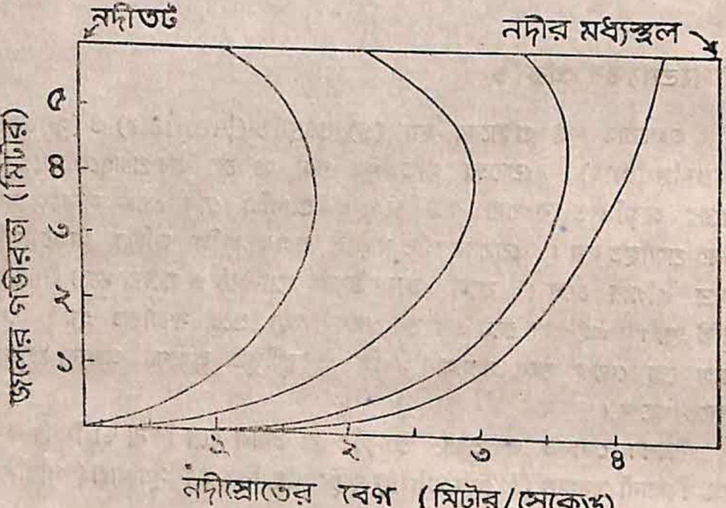
জলস্রোত দুই প্রকারের হয় (১) স্তরাকৃতি (laminar) ও (২) উত্থাল (turbulent)। স্রোতের গতি খুব কম থাকলে জলপ্রবাহকে কয়েকটি স্তরের আকৃতিতে কল্পনা করা চলে। স্তরগুলি যেন একে অন্যকে ঘর্ষণ করে প্রবাহিত হয়। স্রোতের গতি বাড়লে জলকণাগুলি জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে। ফলে স্রোত উত্থাল হয়ে ওঠে ও জলের মধ্যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ ক্রমে এক স্তর থেকে অন্য স্তয়ে সঞ্চারিত হয়। সেই সঙ্গে স্তর থেকে স্তরে ভাসমান পলি ও দ্রবীভূত লবণের আদান প্রদানও চলতে থাকে।

বিশেষ কোনও জলপ্রবাহ স্তরাকৃতি বা উত্থাল হবে কিনা তা নির্ণয় করা যায় বিজ্ঞানী রেনল্ডস (**Reynolds**) কর্তৃক উদ্ভাবিত এক সূত্র দ্বারা (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সংস্তরের সঙ্গে জলের ঘর্ষণের ফলে নদীগর্ভের ঠিক উপরেই জলের বেগ খুব কম হয়। এ অঞ্চলের স্রোত অনেকটা স্তরাকৃতি হয়। শুধু নদীগর্ভেই নয়, নদীতটের কাছেও জলের বেগ খুব কম থাকে। এর কারণ তটভূমির সঙ্গে জলস্রোতের ঘর্ষণ। নদীপাড় থেকে যতই স্রোতের মধ্যস্থলের দিকে যাওয়া যায়, জলের বেগ ততই বাড়তে থাকে। নদীর কেন্দ্রস্থলে, স্রোতের উপরের অংশে বেগ সর্বাপেক্ষা বেশী হয় (১১নং চিত্র)!

জলের গভীরতার তুলনায় স্রোতের গতি খুব বেশী হলে জলস্রোত তীব্র বেগে ছুটে চলে (shooting stage)। এ অবস্থায় প্রবাহকে উচ্চ পর্য্যায়ের স্রোতপ্রবাহ বলে (upper flow regime)। স্রোতের গতি এতটা বেশী না হলে প্রবাহ নিম্ন পর্য্যায়ে থাকে (lower flow regime)। তখন স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় (streaming stage)। উচ্চ ও নিম্ন পর্য্যায়ের নদী প্রবাহের পলল পরিবহণের প্রকৃতিও ভিন্ন। বিজ্ঞানী ফ্রুদ

(Froude) কর্তৃক উদ্ভাবিত সূত্র দ্বারা বোঝা যায় যে স্রোতপ্রবাহ উচ্চ না নিম্ন পর্য্যায়ে আছে ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )।




১১নং চিত্র

নদীর শক্তি তার গতিতে। কোনও নদীখাতে প্রবাহিত জলের মোট ওজন ও তার দুই প্রান্তের উচ্চতার পার্থক্যের গুণফল হল জলের মোট স্থৈতিক শক্তির (potential energy) পরিমাপ। জল প্রবাহিত হলে এই স্থৈতিক শক্তি গতিয় শক্তিতে (kinetic energy) রূপান্তরিত হয় ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। নদীখাত ও জলস্রোতের যে সব প্রকৃতির উপর জলস্রোতের গতি নির্ভর করে, তাদের মধ্যেকার যোগাযোগগুলি নানা গাণিতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায় ( যেমন Chezy ও Manning সূত্র,—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )।

নদীর গতিয় শক্তির শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগই উত্তাপে রূপান্তরিত হয়। উত্তাপসৃষ্টির পর শক্তির যে সামান্য অংশ অবশিষ্ট থাকে তার সাহায্যেই নদী পলল বহন করে। জলস্রোতের উত্তাপ অধিকাংশই ঘর্ষণজনিত। জলকণার সঙ্গে জলকণার ঘর্ষণ, জলস্রোতের সঙ্গে নদীগর্ভ বা নদীতটের ঘর্ষণেই তাপ উৎপন্ন

হয়। যে নদীতে ঘর্ষণ কম, সেখানে শক্তির অপচয়ও কম, তাই পলল পরিবহণের ক্ষমতাও সেই নদীর বেশী।

## নদীর পলি

নদী অববাহিকায় ভূমিক্ষয় হয়ে যে পলির সৃষ্টি হয় তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে নদীখাতে এসে পড়ে। তাছাড়া নদীর জলের ঘর্ষণেও নদীপাড়ের মাটি পাথর ক্ষয়ে গিয়ে পলি উৎপন্ন হয়। নদীগর্ভের শিলাস্তরে বাধা পেয়ে জলরাশি বিক্ষুব্ধ হলে যে ঘূর্ণি ও জলবুদ্বুদের সৃষ্টি হয়, তাদের চাপেও তটভূমির ক্ষয় হয়। খনিজ পদার্থ সম্বলিত এলাকা দিয়ে বয়ে যাবার সময়ে নদীর জলে নানাপ্রকার খনিজ লবন দ্রাবিভূত হয়ে যায়। এদের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেও মাটি পাথরের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের পচনে উদ্ভূত অম্ল নদীর জলে মিশলেও পাথরের ক্ষয় সহজ হয়, আবার পাথর ক্ষয় হয়ে যে বালি কাঁকরের সৃষ্টি হয় তাদের ঘর্ষণেও নদীতটের ক্ষয় দ্রুততর হয়।

কোনও নদী অববাহিকায় ভূমিক্ষয় কতটা হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সেখানকার ভূসংস্থান ও জলবায়ুর উপর। বর্ষার জলের আঘাতে ভূমিক্ষয়ের সূত্রপাত হয় বলেই আমরা জানি, কিন্তু অত্যধিক বর্ষায় মাটির উপর উদ্ভিদের আচ্ছাদন বেড়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল সোজাসুজি মাটিকে আঘাত করতে পারে না, তাই খুব বেশী বর্ষায় ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে কমে যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০—৩৭৫ মিলিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই ভূমিক্ষয় হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। এ পরিমাণ বৃষ্টি প্রচুর উদ্ভিদ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় ভূমিক্ষয় রোধেরও কোনও উপায় থাকে না।

## পলি পরিবহণ

ভূমিক্ষয় জনিত পলি নদীর জল বাহিত হয়ে বহু পথ অতিক্রম করে ক্রমে সমুদ্রে বা হ্রদে গিয়ে পড়ে। দু'ভাবে এই পলি নদীস্রোতে পরিবাহিত হয়—(১) নদীগর্ভের সঞ্চারিত পলি রূপে (২) ভাসমান পলি রূপে। এ ছাড়া খণিজ লবন প্রভৃতি পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় জলের সঙ্গে পরিবাহিত হয়। নদীর জলে

দ্রবিভূত অবস্থায় পরিবাহিত লবনের পরিমাণ বড় কম নয়। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত মহাদেশ গুলি ধুয়ে, নদীর মাধ্যমে বছরে ৩৯০ কোটি মেট্রিক টনেরও বেশী পরিমাণ লবন দ্রবীভূত অবস্থায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে পরিবাহিত লবনের শতকরা ৯০ ভাগই হচ্ছে ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম ঘটিত বাইকার্বনেট, সালফেট ও ক্লোরাইড লবন।

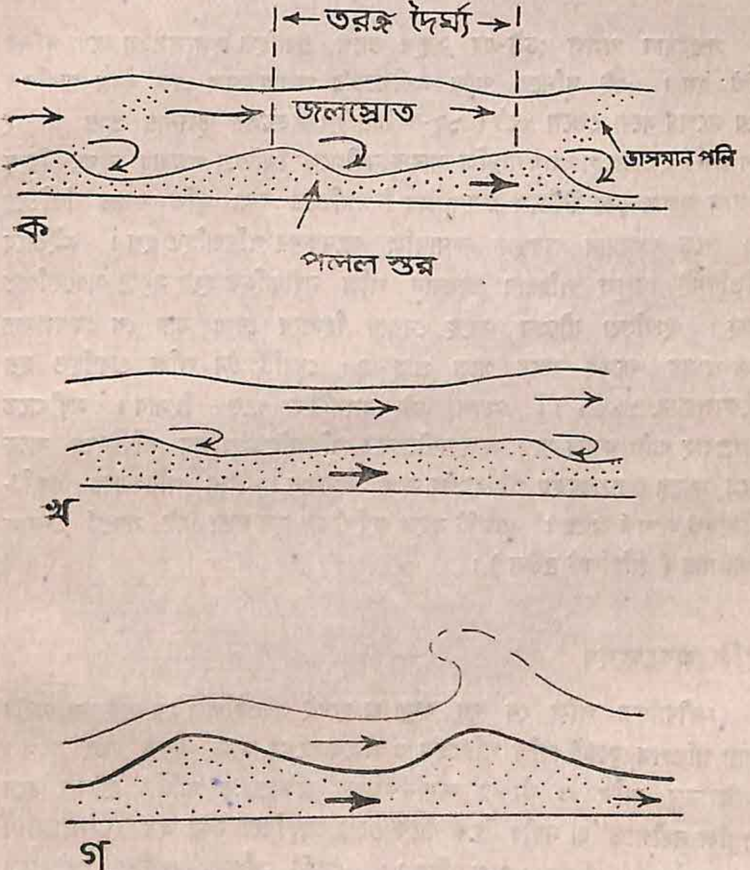
নদীগর্ভের জলস্রোত বিশেষ একটি মাত্রা অতিক্রম করলেই সংস্তরের পললকণার মধ্যে বেগ সঞ্চারিত হয়। নদীগর্ভে সামান্য কোনও বাধা থাকলেই সেখানে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, ফলে পলল পরিবহণ সহজ হয়। চলার পথে পলল কণাগুলি কখনও গড়িয়ে যায়, কখনও বা সাময়িক ভাবে লাফিয়ে উঠে ভাসমান অবস্থায় সামান্য পথ অতিক্রম করে আবার সংস্তরের উপরেই নেমে আসে। কখনও বা জলস্রোত কণাগুলিকে ঠেলে নিয়ে চলে।

নদীগর্ভের পলল কণাগুলির ব্যাস খুব বড় হলে তাকে নাড়াতে যে স্রোতের বেগও খুব বেশী হওয়া চাই তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু মজার কথা এই যে পললের কণাগুলি খুব ছোট মাপের হলেও খুব বেশী মাত্রার স্রোত ছাড়া তাদের নড়ান সম্ভব নয়, কারণ সূক্ষ্ম পলি বা আঁঠাল কাদামাটির কণাগুলি সংস্তরে খুব সুসংবদ্ধ ভাবে থাকে। অবশ্য একবার এই সব ছোট ছোট কণিকার মধ্যে বেগ সঞ্চারিত হলে সামান্য স্রোতেই তাদের পরিবহণ করা সম্ভব।

## পরিবাহিত পললস্তরের আকৃতি

ধরা যাক কোনও একটি নদীগর্ভের মসৃণ পললস্তরের উপর ধীর গতিতে জল প্রবাহিত হচ্ছে। জলপ্রবাহের ঘর্ষণজনিত চাপ একটি বিশেষ মাত্রা (critical shear force) অতিক্রম করলেই পললকণা গুলির মধ্যে বেগ সঞ্চারিত হয়। জলের বেগ আরও বাড়লে সংস্তরের পললকণাগুলি ঢেউ-এর আকারে নিজেদের সাজিয়ে ফেলে ( ১২ ক চিত্র )। স্রোতের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পলল ঢেউগুলির আকার ও আকৃতিও যে কিভাবে বেড়ে চলে ১২ নং চিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে তা দেখান হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে স্রোতের গতি বাড়তে বাড়তে যখন নিম্ন পর্য্যায় থেকে উচ্চ পর্য্যায়ে পৌঁছায় তখন সংস্তরের মসৃণ অবস্থা আবার ফিরে আসে। স্রোতের গতি আরও বাড়লে আবার পলল ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়,

কিন্তু নূতন আকৃতিতে। এবার পললকণাগুলি স্রোতের অনুগামী হলেও পলল ঢেউগুলি হয় স্রোতের বিপরীত মুখী (antidune, ১২ গ চিত্র)। বর্ষার পর অস্থায়ী নদীখাতের জল অপসৃত হবার পরও নদী সংস্তরের পলল ঢেউগুলি




১২নং চিত্র

নদীগর্ভে সঞ্চরমান পলিস্তরের আকৃতি। হাল্কা তীর চিহ্ন দ্বারা জল ও মোটা তীরচিহ্ন দ্বারা পালল কণার গতি নির্দেশ করা হয়েছে।

অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। তখন এদের আকৃতি থেকে বিগত বর্ষায় স্রোত কোনদিকে প্রবাহিত হয়েছিল তা অনুমান করা সম্ভব হয়।

## ভাসমান পলি

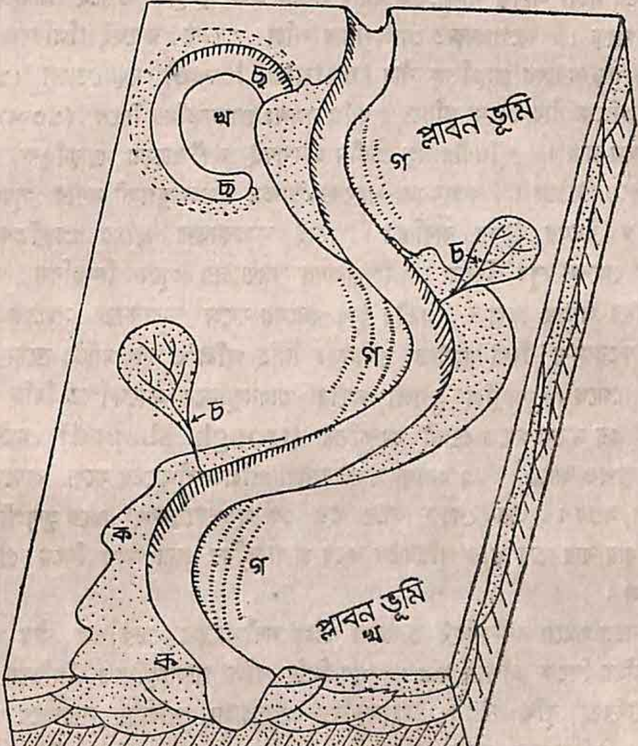
সঞ্চরমান পলল ঢেউ-এর সম্মুখ ভাগে প্রবাহিত জলস্রোতের মধ্যে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণিতে পড়ে নদীগর্ভের পললকণার এক অংশ আবর্তিত হয়ে জলের মধ্যে ভেসে ওঠে ( ১২-ক চিত্র )। জলের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ ভারি হওয়ায় পললকণাগুলি আবার নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু উথাল জলস্রোতের উর্দ্ধচাপ কণাগুলির নিম্নগতিতে বাধা সৃষ্টি করায় থিতিয়ে না পড়ে ভাসমান অবস্থায় কণাগুলি অনেকদূর পরিবাহিত হয়। এইভাবে প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ ভাসমান পলি নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রে অবক্ষেপিত হচ্ছে। হারডিঞ্জ ব্রীজের কাছে নেওয়া হিসাবে দেখা যায় যে কেবলমাত্র গঙ্গা-পদ্মার খাতেই বছরে গড়ে প্রায় ৪৮ কোটি টন পলি প্রবাহিত হয় ( কোলম্যান, ১৯৬৯ )। অবশ্য এটা বাৎসরিক গড়ের হিসাব। নদীখাতে জলপ্রবাহ বাড়া কমার সঙ্গে সঙ্গে নদীস্রোতে পরিবাহিত পলির পরিমাণও বাড়ে কমে, কারণ জলপ্রবাহের পরিমাণের সঙ্গে ভাসমান পলির পরিমাণের একটি-সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। একটি সহজ গাণিতিক সূত্র দ্বারা এই সম্পর্ক প্রকাশ করা যায় ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )।

## পলি অবক্ষেপণ

নদীবাহিত পলি যে শুধু সমুদ্র বা হ্রদেই অবক্ষেপিত হয় তাই নয়, নদীর সমগ্র গতিপথ জুড়েই পলি পরিবহণ ও অবক্ষেপণের কাজ একই সঙ্গে চলে। মোটাদানার বালি ও কাঁকর সাময়িকভাবে জলস্রোতে বাহিত হলেও, ক্রমে সেগুলি নদীগর্ভে বা নদীর বাঁকে বাঁকে চরার আকৃতিতে জমা হয় (channel bar ও point bar, ১৩-গ চিত্র )। একটি সর্পিল আকৃতির নদীপথের বিভিন্ন অংশের পলল বিন্যাস দেখান হয়েছে ১৩ নং চিত্রে।

নদীর বাঁক খুব বড় হয়ে গেলে নদীপথ বৃহৎ বৃত্তের আকার ধারণ করে মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় মূল নদীপ্রবাহ বাঁকের সঙ্কীর্ণ

ব্যবধান ভেদ করে সরলরেখায় প্রবাহিত হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটি মূল নদীখাতের পাশে গো-ক্ষুরাকৃতি হ্রদের আকার ধারণ করে ( ১৩-ছ )। এ ধরণের হ্রদের




১৩নং চিত্র
সর্পিল নদী অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও পলল বিন্যাস

মুখ মোটা দানার বালিতে বন্ধ হয়ে গেলে হ্রদের স্থির জলে মিহি পলি ও মাটির স্তর জমে ওঠে। বার বার প্রবাহপথ পরিবর্তনের ফলে ভাগীরথী নদীর দুধারে এরকম কয়েকটি গো-ক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে ( ১৬ ও ১৭ নং চিত্র )।

পরিণত অবস্থায় নদীর জলস্রোত, নদীবাহিত পলি, নদীখাতের প্রস্থ ও গভীরতার মধ্যে ভারসাম্য বিরাজ করে। এ সময়ে নদীর জল সাধারণতঃ নদীখাতের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও বর্ষার সময়ে জল দু'কূল উপছে প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত মোটাদানার পলি পাড়ের কাছেই থিতিয়ে পড়ে নদীর দুপাড় বরাবর প্রাকৃতিক বাঁধ (natural levee) গড়ে তোলে (১৩-ক) এই প্রাকৃতিক বাঁধ থেকে দুদিকের জমি ক্রমশঃ প্লাবনভূমির দিকে (১৩-খ) ঢালু হয়ে নেমে যায়। পৃথিবীর বহু প্রাচীন জনপদই নদীপাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধের উপর গড়ে উঠেছে। কলকাতা শহরের পশ্চিম অঞ্চল হুগলী নদীর পূবপাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধের উপর অবস্থিত। তাই কলকাতার জমির প্রাকৃতিক ঢাল পশ্চিম থেকে পূব দিকে। শিয়ালদহ অঞ্চলের পূবে কিছুদিন আগেও জলাভূমির অস্তিত্ব ছিল। গভীর কূপ খননের ফলে কলকাতা সহরের মাটির নিচে কয়েক'শ ফিট পর্য্যন্ত প্রধানতঃ মিহি পলি ও কাদামাটির স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হুগলী নদীর প্লাবনভূমিতে অবক্ষেপিত মিহি পলির স্তর। এর মাঝে মাঝে দ্রোনী আকৃতির (trough shaped) মোটাদানার বালির স্তূপও আছে। এ ধরণের মোটাদানার পলি নদীখাতের মধ্যে অবক্ষেপিত হওয়াই সম্ভব। এর থেকে মনে হয় যে গত কয়েকশ' বছরে হুগলী নদীর খাতটি বার বার তার স্থান পরিবর্তন করে প্লাবনভূমির নানা অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

বন্যার সময়ে নদীবাহিত ভাসমান পলি নদীপাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধ উপছে প্লাবনভূমির দিকে এগিয়ে যায়। খুব মিহি পলি প্লাবনভূমিতে থিতিয়ে পড়ে তার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। প্লাবনভূমির গাছপালা পলিস্তর সংরক্ষণে সাহায্য করে। পলিস্তরের মধ্যে উদ্ভিতাদির পচনে অনেক সময়ে পীট (peat) নামে একপ্রকার নিম্নমানের জ্বালানীর সৃষ্টি হয়। কলকাতার মাটির নিচে এরকম দুটি পীট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে—একটি ১৮ থেকে ৩৫ ফিটের মধ্যে, অপরটি ৫০০ ফিট গভীরে। হুগলী নদীর পূর্বতন প্লাবনভূমিতেই যে এই পীট স্তরের জন্ম তাতে সন্দেহ নেই।

বন্যার বেগ খুব বেশী হলে জলের তোড়ে নদীপাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট শাখানদীর আকারে জলস্রোত প্লাবনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে (১৩-চ, চিত্র)। এই সব শাখানদীতে জলের স্রোতের সঙ্গে কিছু কিছু মোটা

দানার বালিও প্রবেশ করে প্লাবনভূমিতে থিতিয়ে পড়ে। কলকাতার মাটির নিচে মিহি পলিমাটির স্তরের মধ্যে স্থানে স্থানে যে মোটাদানার বালির ঢিপি দেখা যায়, তাদের অনেকগুলির জন্ম হয়তো এভাবেই হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নদীখাত সংরক্ষণ ও প্লাবনভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পদ্ধতি আমাদের অগোচরে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় সভ্য মানুষ সন্তুষ্ট নয়। তাই মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই সেচের জন্য নদী থেকে খাল কেটে দূরের জমিতে জল নিয়ে যাবার চেষ্টা চলে আসছে। বলাই বাহুল্য যে নদী থেকে জল নিয়ে নিলে মূল নদীখাতে জলের অপ্রতুলতার ফলে পলি পরিবহণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এতে জলস্রোতে ভাসমান পলি নদীগর্ভেই থিতিয়ে পড়ে নদীখাতকে অগভীর করে তোলে, ফলে অল্প বর্ষাতেই বন্যা হয়।

মানুষ বন্যা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে নদীপাড় বরাবর কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে। কৃত্রিম বাঁধ সাময়িক ভাবে বন্যা প্রতিরোধে সমর্থ হলেও পলি পরিবহণ ও অবক্ষেপণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারলে নদীবাহিত পলি নদীগর্ভেই অবক্ষেপিত হয়ে তাকে আরও অগভীর করে তোলে, তাই বন্যার সম্ভাবনাও বাড়ে, আর মিহিপলির অভাবে প্লাবনভূমির উর্বরতাও কমে আসে।

মোটকথা, বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে নদীপাড় বরাবর বাঁধ দিলে, অথবা সেচের জন্য সেই বাঁধ কেটে জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে সাময়িক সুফল হয়তো ফলে, কিন্তু সামগ্রিক ক্ষতির আশঙ্কা বাড়ে। স্মরণীয় কালের মধ্যেই দামোদর নদের পাড় বরাবর পর পর পাঁচটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে, কিন্তু তাতেও বন্যা রোধ করা যায় নি। উপরন্তু এ ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের এক বিরাট অঞ্চল নানারকম দীর্ঘস্থায়ী অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

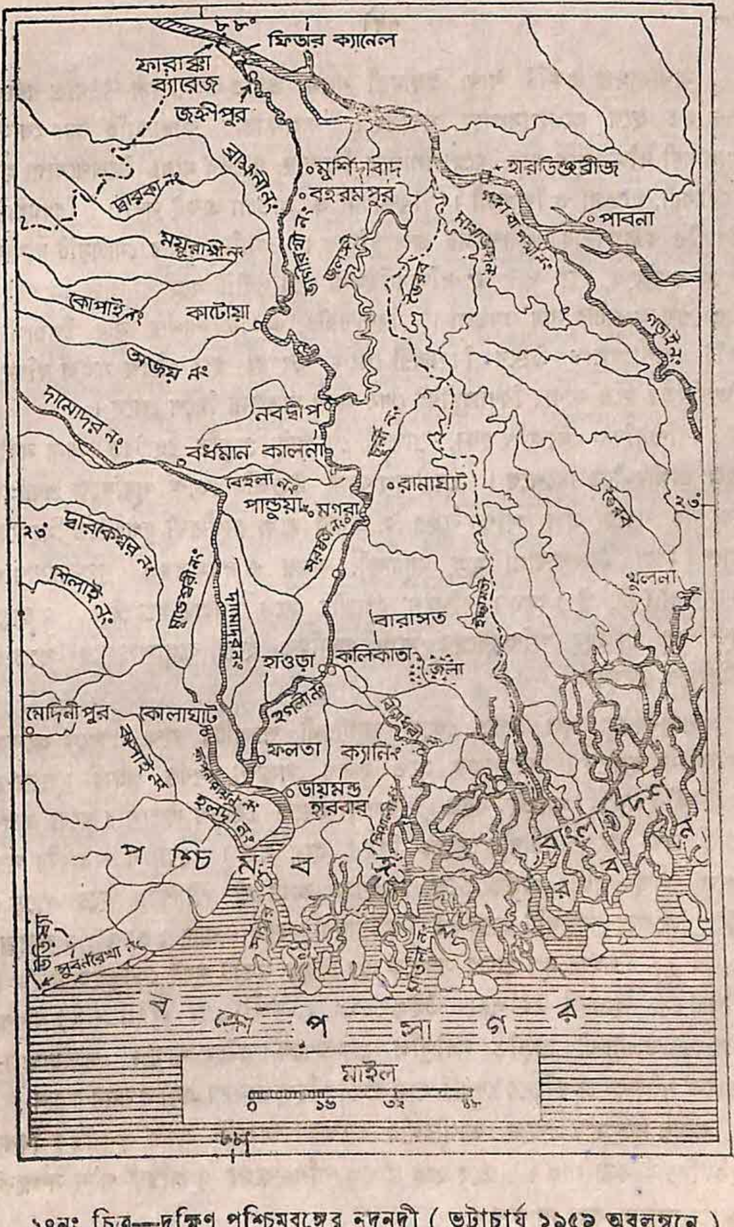
# ১. পশ্চিমবঙ্গের নদী পরিচিতি

এ রচনায় পশ্চিমচঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের নদনদীর বিষয়ে আলোচনা করা হবে। গঙ্গার উত্তরে, হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলের নদীগুলি এ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গানদী মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সীমান্ত বরাবর পশ্চিম থেকে পূব দিকে প্রবাহিত। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে এটিই একমাত্র নদী যার উৎস হিমালয়ের তুষার গলা অঞ্চলে অবস্থিত। তাই সারাবছরই এর খাতে জল থাকে। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করার আগেই কোশী নদী উত্তর দিক থেকে নেমে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে কোন নদীই হিমালয় থেকে নেমে এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয় নি।

গঙ্গার প্রধান স্রোতটি পশ্চিমবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে পূর্ববঙ্গের ( বাংলাদেশ ) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে এটি পদ্মা নামে পরিচিত। ভাগীরথী-হুগলী ও পদ্মা-মেঘনার মধ্যেকার ত্রিভূজাকৃতি অঞ্চলটিই গঙ্গার ব-দ্বীপ। এর আয়তন প্রায় ৫৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অসংখ্য শাখানদী এই বিরাট ব-দ্বীপকে কেটে কেটে সমুদ্রে মিশেছে। এই ব-দ্বীপের প্রধান ভাগটি বাংলাদেশের একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত। এর পশ্চিম অংশের সামান্য একটি ভাগ পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে পড়েছে।

ফারাক্কা পার হয়েই গঙ্গা দক্ষিণ দিকে তার শাখা বিস্তার করেছে। দক্ষিণের প্রথম বড় শাখাটির নাম ভাগীরথী ( ১৪ নং চিত্র )। এর পর ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী প্রভৃতি গঙ্গার শাখা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। ভাগীরথী নদী বহরমপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ, চুঁচুঁড়া ও কলকাতার পাশ দিয়ে মোটামুটি ভাবে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৩৫০ মাইল প্রবাহিত হয়ে সাগর দ্বীপের পাশ দিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। সাগর থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত নদীখাতে জোয়ার-ভাটা খেলে। প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ নদীর এই অংশটি হুগলী নামেই পরিচিত। এর উত্তরের অংশটির নাম ভাগীরথী।




১৪নং চিত্র—দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের নদনদী ( ভট্টাচার্য ১৯৫৭ অবলম্বনে )

মাথাভাঙ্গার একটি শাখা ইছামতী নামে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। কলকাতার কাছাকাছি আর যে সব শাখানদী দক্ষিণপূবে বয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যাধরী, মাতলা ও পিয়ালী। বিদ্যাধরী ও মাতলা একই নদী। বিদ্যাধরীর উৎপত্তি কলকাতার পূর্বাঞ্চলের জলাভূমিতে। ক্যানিং পর্যন্ত মোটামুটি দক্ষিণ-পূবে প্রবাহিত হয়ে তারপর দক্ষিণাভিমুখী হয়ে নদীটি বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এর শেষ অংশটির নাম মাতলা। বিদ্যাধরীর একটি শাখার নাম পিয়ালী। এটি সোনারপুরের উত্তরে বিদ্যাধরী থেকে উৎপন্ন হয়ে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আবার বিদ্যাধরীরই শেষ অংশ মাতলায় মিশে গেছে।

পশ্চিমদিক থেকে দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, কোপাই প্রভৃতি ছোটবড় নানা নদীর জল ভাগীরথীতে মিশেছে। ছোটনাগপুরের উচ্চভূমি থেকে পূর্বদিকে প্রবাহিত যে সব নদীর জল পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে ভাগীরথী হুগলীতে মিশেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ময়ূরাক্ষী, অজয় ও দামোদর। রূপনারায়ণ ও কংসাবতী ( কাঁসাই ) আরও দক্ষিণে হুগলীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ ছাড়া সুবর্ণরেখা কিছুদূর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে উড়িষ্যার উপকূলে।

গঙ্গা-পদ্মার মূল স্রোত থেকে ভাগীরথী শাখাটির জন্ম সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী-হুগলীর খাতেই বইত। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে জল-স্রোত পদ্মা ও ভাগীরথীর খাতে বিভক্ত হয়ে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পর প্রধান প্রবাহ পদ্মার খাতে চলে যাওয়ায় ভাগীরথী শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি ভাবে এই মত সমর্থন করেন ( রায়, ১৩৪৫ ; মজুমদার, ১৯৪২ )। গঙ্গার মূল প্রবাহ সম্পর্কে এর বিরুদ্ধ মতটি খুবই কৌতূহলদ্দীপক। বিশিষ্ট সেচ বিজ্ঞানী উইলিয়াম উইলকক্সের (William Willcox) ধারণা ছিল যে ভাগীরথী প্রভৃতি নদীগুলি প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম খাল। গঙ্গার জল-স্রোতকে দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রাচীন হিন্দু রাজারা এগুলি খনন করান।

গঙ্গার মূলস্রোত থেকে ভাগীরথীর জন্মের সমস্যাটি এবার ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করা যাক্। তবে তার আগে পশ্চিমবঙ্গের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

## পশ্চিমবঙ্গের ভূতাত্ত্বিক গঠন

ভূতত্ত্বের ভাষায় পূর্ব আর পশ্চিমবঙ্গের মিলিত ভূখণ্ডের নাম বঙ্গ অববাহিকা (Bengal basin)। গত কয়েক লক্ষ বছরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখা-নদী বাহিত পলিমাটিতে বঙ্গ অববাহিকার বর্তমান ভূপ্রকৃতি গঠিত হয়েছে। এই পলিমাটি নিচেকার সমস্ত পললস্তরকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সেইসঙ্গে বহুকোটি বছরের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসও চাপা পড়ে গেছে।

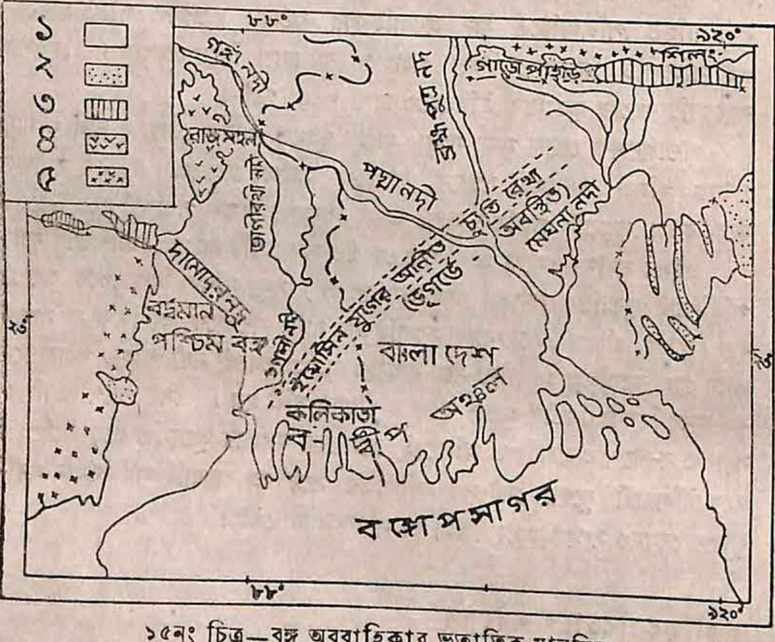
পঞ্চাশদশক থেকে নানা সংস্থা বাংলা ভূগর্ভে খনিজ তেল, ভূ-জল ও নানা প্রকার খনিজ পদার্থের সন্ধানে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালাচ্ছেন। এই সমীক্ষার ফলে বাংলা ভূগর্ভের প্রকৃতিও আস্তে আস্তে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে।

এইসব সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে গত সাতকোটি বছরে ( 'টার্শিয়ারী যুগ'-পরিশিষ্টে 'ভূতাত্ত্বিক সময়ের বিভাজন' দ্রষ্টব্য ) সমুদ্র দক্ষিণ দিক থেকে অন্ততঃ বার তিনেক এগিয়ে এসে বঙ্গ অববাহিকার নানা অঞ্চলকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছিল। সমুদ্র সরে যাওয়ার পর প্রতিবারই নদী বাহিত পললস্তরে বঙ্গ অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। সেই প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্র ও ব-দ্বীপে অবক্ষেপিত পলিতেই ক্রমে ক্রমে বাংলার ভূপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে। তবে টার্শিয়ারী যুগের সেই সব নদীগুলির সঙ্গে বঙ্গ অববাহিকার বর্তমান নদী-গুলির কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা সঠিক জানা নেই।

## ভূতাত্ত্বিক বিচারে নদীপথ

বিহারের রাজমহল পাহাড় ও আসামের গাড়ো পাহাড়ের উচ্চ মালভূমির মধ্যেকার এক অপরিসর নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে গঙ্গা বঙ্গ অববাহিকায় প্রবেশ করেছে ( ১৫নং চিত্র )। ভূবিদ্‌দের কাছে এই অঞ্চলটি Garo-Rajmahal Gap নামে পরিচিত। একটি নাতিউচ্চ পর্বতশ্রেণী অতীতে রাজমহল ও গাড়ো পাহাড়কে সংযুক্ত করে রেখেছিল, পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই পর্বতশ্রেণী অবনমিত হয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মাপুত্রের পলিস্তরের নিচে চাপা পড়ে গেছে। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় এই চাপা পড়া পর্বতশ্রেণীর মধ্যে একাধিক গিরিখাতের সন্ধান পাওয়া গেছে। হয়তো সে যুগে গঙ্গা এই গিরিখাত দিয়েই বঙ্গ অববাহিকায় প্রবেশ করত। আবার অনেকের মতে গত সাতকোটি বছরের

অনেকটা সময়েই এই পর্বতশ্রেণী গঙ্গাকে বঙ্গ অববাহিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। টার্শিয়ারী যুগের শেষের দিকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে গঙ্গা ঐ গিরিখাতের মধ্যেকার উপত্যকা দিয়ে বঙ্গ অববাহিকায় প্রবেশ করে।




১৫নং চিত্র—বঙ্গ অববাহিকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র
১। বর্তমান কালের নদীবাহিত পললস্তর ২। টার্শিয়ারী যুগের পাললিক শিলা ৩। মেসোজোয়িক যুগের পাললিক শিলা ৪। ব্যাসল্ট শিলা ৫। আর্কিয় যুগের শিলা

টার্শিয়ারী যুগের বাংলা অববাহিকার সমস্ত পলিস্তরের ঢাল দক্ষিণপূব দিকে। অর্থাৎ পলি অবক্ষেপনের সাথে সাথে তখন অববাহিকাটি ঐ দিকে আনত হচ্ছিল। ঐ সময়ে অববাহিকার সমস্ত নদ নদীই সম্ভবতঃ ঐ ঢাল অনুসরণ করে দক্ষিণ পূব দিকেই প্রবাহিত হ'ত। এই তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে দক্ষিণ পূব দিকে প্রবাহিত পদ্মার খাতই গঙ্গার মূল প্রবাহপথ। ভাগীরথী-হুগলী একটি শাখানদী মাত্র।

ভূতাত্বিক সমীক্ষায় বাংলা ভূগর্ভে, ইয়োসিন যুগের ( পরিশিষ্টে 'ভূতাত্বিক সময়ের বিভাজন' দ্রষ্টব্য ) পললস্তরে একটি ভাঁজ বা আনতির (hinge) অস্তিত্ব ধরা পড়েছে ( ১৫নং চিত্র )। ইয়োসিন ও তার পরবর্তি যুগে নানা সময়ে কব্জার ভাঁজের মত ঐ অঞ্চলটি নেমে যাওয়ায় বাংলা সমতলভূমির দক্ষিণ পূব ভাগ বারবার আনত হয়েছিল। এই ওঠা নামার জন্য ইয়োসিন পরবর্তি যুগের পললস্তরে কতগুলি চ্যুতি রেখার সৃষ্টি হয়। বাংলা সমতলের শাখানদীগুলি সম্ভবতঃ সেইসব চ্যুতিরেখার পথ ধরেই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা-পদ্মার মূল খাত থেকে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ভাগীরথী-হুগলী হয়তো ঐ রকমই একটি শাখা নদী। অবশ্য কয়েক শতাব্দী আগেও যে ভাগীরথী-হুগলীর খাতে জলপ্রবাহ অনেক বেশী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বহু ঐতিহাসিক তথ্য তার সাক্ষ্য বহন করছে। সাম্প্রতিককালে জলপ্রবাহ ক্ষীণতর হয়ে যাবার কারণ নদীর প্রবাহপথের পরিবর্তন নয়, নদীখাতে অত্যাধিক মাত্রায় পলি অবক্ষেপণ। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

শুধু ভাগীরথী-হুগলী নয়, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যান্য নদীগুলির প্রবাহপথেও কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণপূবে প্রবাহিত দামোদর নদ বর্দ্ধমানের বারো মাইল পূবে হঠাৎ দক্ষিণদিকে ঘুরে গেছে ( ১৪নং চিত্র )। দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের সব নদীপথই একই রকম ভাবে হঠাৎ দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে।

পুরোনো ম্যাপচিত্র (Van den Broucke, ১৬৬০, রায় ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য) থেকে মনে হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দামোদরের স্রোত পূবমুখী ছিল। তখন সম্ভবতঃ বেহুলা প্রভৃতি নদীর খাত বেয়ে কালনার কাছাকাছি কোনও এক জায়গায় দামোদরের জল হুগলীতে মিশত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে দামোদর হয়তো সরস্বতীর খাত বেয়ে হুগলীতে পড়ত, কারণ তখন সরস্বতীর খাত প্রশস্ততর ছিল ( ভট্টাচার্য, ১৯৫৯ )। ১৮৫৬-র আগে দামোদরের জল যে সেলিমবাদের কাছের একটি খাত দিয়ে নিষ্কাশিত হতো তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬৫ সালে সেলিমবাদের দক্ষিণে বেওয়া খাল খনন করা হয়। তারপর থেকে দামোদরের বন্যার জল এই পথে, মুণ্ডেশ্বরী হয়ে, কোলাঘাটের কিছু দক্ষিণে রূপনারায়ণে এসে পড়ে।

অনেকের মতে ১৭৭০-এর বন্যার পর থেকেই দামোদর হঠাৎ দক্ষিণদিকে

ঘুরে যায়। কিন্তু উপরের তথ্যগুলি বিচার করলে মনে হয় যে গত তিন শতাব্দীতে দামোদর ক্রমে ক্রমে দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে। এই দিক পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে বর্দ্ধমান-কালনা-কলকাতা ত্রিভূজের মধ্যেকার অসংখ্য মজে যাওয়া খাল ( কানা নদী ), যেগুলি দিয়ে এক সময়ে দামোদরের জল নিষ্কাষিত হতো। মগরা, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মাটির নিচে যে বালির স্তূপ দেখা যায়, সেগুলি এই কানা নদীর মজে যাওয়া খাতের বালি।

দামোদরের দিক পরিবর্তনের কারণ নিয়ে নানা মত আছে। উইলকক্সের অনুমান ছিল যে দামোদর অঞ্চলের কানা নদীগুলি প্রাচীনকালে সেচের জন্য কাটা কৃত্রিম খাল। অবশ্য অধিকাংশ নদীবিজ্ঞানীই এ বিষয়ে উইলকক্সের সঙ্গে একমত নন। তাঁদের ধারণা যে ক্রমাগত পলি অবক্ষেপনে প্রবাহপথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দামোদর পথ পরিবর্তন করেছে। বিহারের উচ্চভূমি থেকে বাংলার সমতলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভের ঢাল কমে যাওয়ায় পলি অবক্ষেপণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে শুধু পলি অবক্ষেপণ বা বন্যার জন্য দামোদর বার বার দিক পরিবর্তন করেছে বলে মনে হয় না। দামোদরের মূল খাতে জল বেড়ে গেলে বেহুলা প্রভৃতি পূবমুখী খাল দিয়ে সহজপথে জল বেড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া শুধু দামোদর নয়, দারকেশ্বর, রূপনারায়ণ প্রভৃতি অনেক নদীই এই অঞ্চলে তাদের গতিপথ পালটে দক্ষিণাভিমুখী হয়েছে। অনুমান করা যায় যে বাংলা ভূগর্ভের কোনও ধীরগতি (slow) অথচ দীর্ঘস্থায়ী (prolonged) পরিবর্তনের সঙ্গে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের রহস্যটি জড়িত আছে।

টার্শিয়ারী যুগের বাংলা ভূগর্ভের বিভিন্ন সময়কার পললস্তরের মানচিত্র তুলনা করলে বোঝা যায় যে ভূগর্ভস্থিত পললস্তরের ঢাল ক্রমে ক্রমে দক্ষিণপূব থেকে দক্ষিণ দিকে সরে এসেছে ( সেনগুপ্ত, ১৯৭২ )। বলাই বাহুল্য যে এই পরিবর্তনের হার অত্যন্ত সামান্য। বর্তমানকালে এই পরিবর্তন অব্যাহত আছে কিনা তা বোঝারও কোন উপায় নেই। যদি তা থেকে থাকে তবে নদী-গুলির দিক পরিবর্তনের একটা ব্যাখ্যা হয়তো এর থেকে পাওয়া যেতে পারে।

অনুমান করা যায় যে অত্যাধিক পলি অবক্ষেপণে নদীগুলির পূবমুখী খাত বন্ধ হয়ে গেলে জল নিষ্কাশনের তাগিদে তারা গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় বাংলা অববাহিকার দক্ষিণাভিমুখী ঢালের পথ অনুসরণ

করে নদীগুলির ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখী হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ইংরাজ আমলের গোড়ার থেকে রেলপথ, রাস্তা প্রভৃতির জন্য বার বার নদীর পাড়ে বাঁধ নির্মাণ ও সেচের জন্য স্থানে স্থানে খাল কেটে জল নেবার যে ব্যবস্থা চলে এসেছে তাতেও নদীগর্ভে পলি অবক্ষেপণের পরিমাণ বেড়েছে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই গত ২০০৷২৫০ বছরে নদীগুলির প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি গঙ্গার মূল খাতেও প্রবাহপথ পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ যে গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের অদূরে গঙ্গার দক্ষিণপাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। এর ফলে গঙ্গার স্রোত ক্রমশঃ সরে এসে ভাগীরথীর খাতের সঙ্গে মিশে যাবার সম্ভাবনা আছে। অনুমান করা যায় যে গঙ্গার এই দক্ষিণাভিমুখী গতি উপরে আলোচিত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনেরই ফল। গঙ্গা নদীর প্রবাহপথ পরিবর্তনের ফলে ঐ অঞ্চলে সাময়িক অসুবিধা দেখা দিলেও হয়তো এতে দীর্ঘস্থায়ী সুফলই ফলবে, কারণ ভাগীরথী খাতে জলের অপ্রতুলতার জন্য যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, গঙ্গা ভাগীরথীর মিলনে তার একটা স্থায়ী সমাধান হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

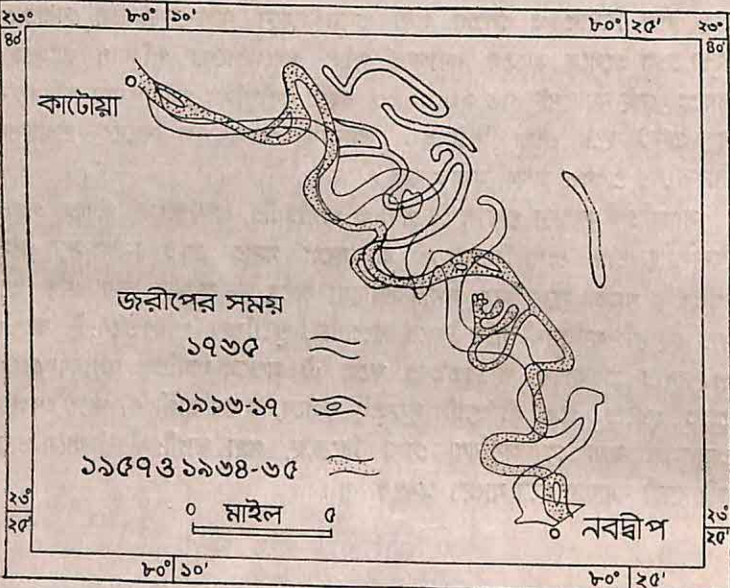
## ২. পশ্চিমবঙ্গের নদী সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলির সমস্যাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— (১) ভাগীরথী-হুগলীর সমস্যা (২) দামোদর-রূপনারায়ণের সমস্যা। এ দুটি সমস্যা আবার পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সে আলোচনা পরে করা হবে।

### ভাগীরথী-হুগলীর সমস্যা

ভাগীরথী একটি সর্পিল আকৃতির নদী। প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত সর্পিল নদীপথের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ভাগীরথী অববাহিকায় দেখা যায়। প্রাচীন মানচিত্রে অঙ্কিত নদীখাতের সঙ্গে বর্তমান খাতের তুলনা করলে বোঝা যায় যে বার বার এই নদীটি তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করেছে (১৬নং চিত্র)। এর ফলে বর্তমান নদীখাতের দুধারে গো-ক্ষুরাকৃতি হ্রদ ও ছোটবড় নানা বিলের সৃষ্টি

হয়েছে। ভাগীরথীর সঙ্গে অজয় ও জলঙ্গীর সঙ্গমস্থলের মধ্যবর্তী স্থানেই এই দিক পরিবর্তনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এ অঞ্চলে পুরনো খাত পরিত্যাগ করে নদীটি

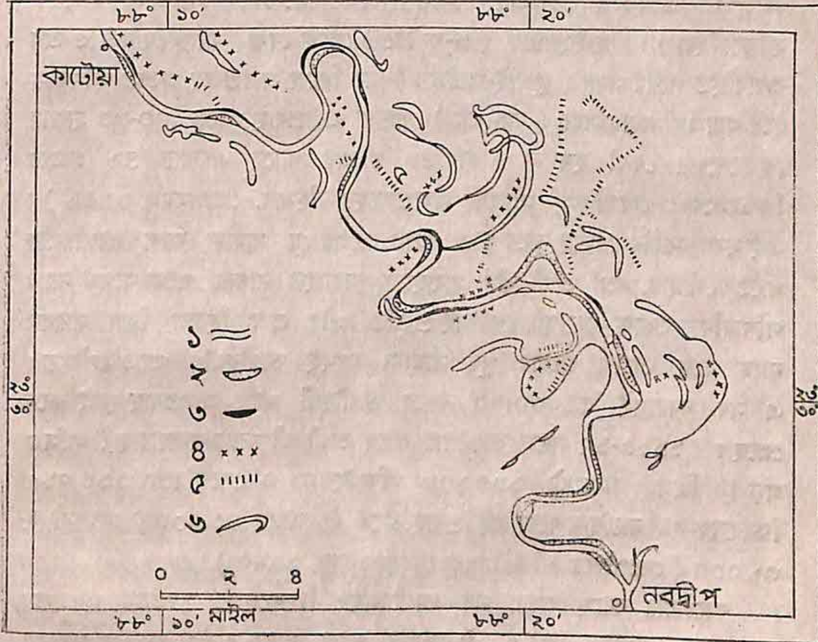



১৬নং চিত্র—কাটোয়া ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ভাগীরথীর প্রবাহপথ ( বসু ও কর, ১৯৭০ অবলম্বনে )। সর্পিল নদী কিভাবে বার বার তার গতিপথ পরিবর্তন করে, এই নক্সা থেকেই তা বোঝা যাবে।

বার বার সরে যাওয়ায় সমতলবেদী ও সোপানশ্রেণীর (terraces) সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন পূর্বের এক জরীপে কাটোয়া সহরে নদীর বাঁকের কাছে এরকম পাঁচটি সোপানের সন্ধান পাওয়া গেছে ( বসু ও কর, ১৯৭০ )। নদীটি যে পাঁচটি ধাপে তার পুরনো খাত ছেড়ে পাশে সরে এসেছে, এটি তারই প্রমাণ। ভাগীরথীর এই দিক পরিবর্তনের ফলে নদীর অবতল বাঁকে অবস্থিত অনেক প্রাচীন জনপদ ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। একই সঙ্গে নদীর উত্তল বাঁকে নূতন কৃষিযোগ্য ভূমির সৃষ্টি হয়েছে ( বসু, ১৯৬৭, ১৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

সর্পিল আকৃতির নদীপথের দিক পরিবর্তনের ফলে কি ভাবে একপাড়ে ধস নেমে জনপদ নদীগর্ভে বিলীন হয় ও অন্যপাড়ে চরের আকারে নূতন ভূখণ্ডের আবির্ভাব হয়, প্রথম পরিচ্ছেদেই তার আলোচনা করা হয়েছে।

মূল প্রবাহপথ পরিত্যাগ করে বার বার ভাগীরথী নদীর পাশে সরে যাবার প্রধান কারণ যে অত্যধিক হারে পলি অবক্ষেপণ, তা বলাই বাহুল্য। ক্রমাগত




১৭নং চিত্র—কাটোয়া ও নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথের দুধারে অবস্থিত গো-ক্ষুরাকৃতি হ্রদ, সমতল বেদী ও কৃত্রিম বাঁধ। নদীর উত্তাল বাঁকে বাঁকে বালির চর ও বিপরীত দিকের পাড়ে ধস লক্ষণীয়। ( সুভাষরঞ্জন বসু-কৃত জরীপ, ১৯৬৪ ৬৫, অবলম্বনে, বসু ও কর, ১৯৭০ )। ১—ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহপথ ; ২—নদীর উত্তাল বাঁকে বালির চরা ; ৩—নদীর অবতল বাঁকে ধস ; ৪—সমতল বেদী ; ৫—নদীপাড়ে কৃত্রিম বাঁধ ; ৬—নদীপথের দুধারে গো-ক্ষুরাকৃতি হ্রদ ( বিল )।

পলি অবক্ষেপণের ফলে ভাগীরথীর উৎসস্থান গঙ্গার মূল খাত থেকে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু হয়ে গেছে। এরই ফলে গত প্রায় তিনশ বছর যাবৎ গঙ্গার জলপ্রবাহ মূলত পদ্মার খাত দিয়েই সমুদ্রে নিষ্কাষিত হচ্ছে, দক্ষিণে ভাগীরথীর খাতে প্রবাহ নিতান্তই ক্ষীণ। গঙ্গার জলপ্রবাহ ভাগীরথীর খাতে নামে কেবলমাত্র বর্ষার ঠিক পরে ( আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ), যখন গঙ্গার খাতে জলের মাত্রা গড়ে দশলক্ষ কিউসেক ছাড়িয়ে যায় ( ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে ২৫ লক্ষ কিউসেক ছাড়িয়েছিল )। হাইড্রোগ্রাফ ( ৯-ক চিত্র ) থেকে দেখা যাচ্ছে যে বর্ষা ও তার অব্যবহিত পরের সময় ( জুলাই-অক্টোবর ) বাদ দিলে জলপ্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণকায় হয়ে যায়। খরার সময় ( মার্চ -মে ) গঙ্গার জলপ্রবাহ গড়ে ৭০-৮০ হাজার কিউসেকের বেশী হয় না ( হারডিঞ্জ ব্রীজের কাছে একবার ৪২ হাজার কিউসেকেও নেমেছিল, মাসিক জলপ্রবাহের হিসাব, কোলম্যান, ১৯৬৯ )। এই সময়, মাটির ভেতরে চুঁয়ে চুঁয়ে গঙ্গার জলের যে সামান্য অংশ ভাগীরথীর খাতে পৌঁছায়, তা ভাগীরথীর প্রবাহকে অব্যাহত রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পশ্চিমদিক থেকে ময়ূরাক্ষী, কোপাই প্রভৃতি নদীর জল হিজল বিল মারফৎ নামে বলে তাদের জলের খুব সামান্য অংশই ভাগীরথীর খাতে পৌঁছায়। এ সব কারণেই গত ৫০।৬০ বছরে ভাগীরথী খাতে জলপ্রবাহ খুবই কমে গেছে। ১৯১৫-১৭ সালে কাটোয়ার কাছে ভাগীরথী খাতে জলপ্রবাহ ( মাসিক গড় ) ছিল আগস্টে ১০৬,৯৫৮ কিউসেক ও সেপ্টেম্বরে ১১০,৭১৫ কিউসেক। ষাটের দশকে এই প্রবাহ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬,০০০ ( আগস্টে ), ৩১,০০০ ( সেপ্টেম্বরে ) কিউসেকে ( বসু ও কর, ১৯৭০ )।

কাটোয়ার কাছে অজয় নদ ভাগীরথীতে মিশেছে। সাঁওতাল পরগণার উচ্চভূমিতে অজয়ের জন্ম। ঐ অঞ্চলে খরার সময়ে বৃষ্টির অভাবে অজয়ের খাতে জল প্রায় থাকে না বললেই চলে। আবার বর্ষার সময় ঢল নামায় কখনও কখনও জলপ্রবাহ তিনলক্ষ কিউসেকও ছাড়িয়ে যায়। এই জলস্রোত ভাগীরথীতে নামলে, ভাগীরথীর ক্ষীণকায় খাতের পক্ষে তা নিষ্কাষন করা সম্ভবপর হয় না। ফলে হয় বন্যা। এ কারণেই, ১৯০৫ থেকে ১৯৬৯-এর মধ্যে অন্ততঃ বারো বার এ অঞ্চলে প্রবল বন্যা হয়েছে। এজন্য কোনও কোনও নদীবিজ্ঞানী অজয়ের উপর বাঁধ নির্মাণ করে তার জলস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবার পরামর্শ দিয়েছেন ( বোস, ১৯৭২ )।

অজয়ের দক্ষিণে যে নদীসমষ্টি পশ্চিমদিক থেকে এসে ভাগীরথীতে মিশেছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল দামোদর ও রূপনারায়ণ। এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃথকভাবে করা হবে। এখানে এটুকু বলে রাখা দরকার যে বাঁধ ও মানুষসৃষ্ট নানা কৃত্রিম বাধার জন্য এই সব নদীর জলের খুব সামান্য অংশই ভাগীরথী-হুগলীর খাতে পৌঁছায়।

জলের অপ্রতুলতা ছাড়াও হুগলী নদীর অন্যতম প্রধান সমস্যা হল অত্যধিক হারে পলি অবক্ষেপণ। বসু ও কর (১৯৭০) প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ভাগীরথীর খাতে সারাবছরই গড়ে প্রতি লিটার জলে প্রায় ০·৪২ গ্রাম পলি ভাসমান অবস্থায় পরিবাহিত হয়। এটা বাৎসরিক গড়। স্থান বিশেষে বর্ষার সময়ে ভাসমান পলির পরিমাণ প্রতি লিটার জলে ১·৭০ গ্রাম পর্যন্তও হয়ে থাকে।

হুগলী মোহানার কাছাকাছি জোয়ারের জলস্রোতে বাধা পেয়ে এই বিপুল পরিমাণ পলির অনেকটা অংশই নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়ে। এছাড়া হুগলী মোহানার কাছে জোয়ারের তুলনায় ভাটার প্রবাহকাল বেশী হওয়ায় ভাটার স্রোতের বেগ অপেক্ষাকৃত কম হয়। এর ফলে জোয়ারের সময়ে মোহানার মুখ থেকে যে বালি স্রোতের সঙ্গে হুগলী খাতে প্রবেশ করে, তার অনেকটা অংশই আবার ভাটার টানে বেরিয়ে না গিয়ে নদীগর্ভেই থিতিয়ে পড়ে নদীখাতকে অগভীর করে তোলে।

জোয়ার থেকে উঠে আসা বালি হুগলী নদীখাতে কতদূর পর্যন্ত চলাচল করে সে সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে জোয়ারের জল হুগলী নদীর ভেতরে প্রায় হালিসহর পর্যন্ত সংস্তরের বালিকে ঠেলে আনে ( বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রবর্তী ১৯৬৫ দ্রষ্টব্য )। কিন্তু কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের সংগৃহীত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে জোয়ার ভাটার জন্য হুগলী খাঁড়ির পশ্চিমপ্রান্তে সংস্তরের বালির গতি হল উর্ধ্বমুখী (upstream), কিন্তু পূর্বপ্রান্তে নিম্নাভিমুখী (downstream)। সুতরাং জোয়ারের সময়ে যে বালি হুগলী খাঁড়িতে প্রবেশ করে, ভাটার টানে তা নেমে এসে অকল্যাণ্ড চ্যানেলের কাছে (Auckland channel) জমা হয় ( চক্রবর্তী ও সেন, ১৯৭২ )।

ভাসমান পলি ছাড়াও "আর এক শ্রেণীর অর্দ্ধতরল, মণ্ডের মত, অত্যধিক লবণাক্ত পলি······জোয়ারের জলের উচ্চাভিমুখী গতির সঙ্গে সঙ্গে নদীর

জলের নিচের স্তরে, নদীগর্ভের গা বেয়ে লাভা প্রবাহের মত মোহানায় অনেকদূর পর্য্যন্ত উঠে আসে" ( কপিল ভট্টাচার্য্য, ১৯৫৯ )। এটি সম্ভবতঃ মোহানার মুখের সংস্তরের উপরের গতিশীল পলিস্তর (sand bed layer)। শ্রী ভট্টাচার্য্যের মতে এই পলিস্রোতের অবক্ষেপণও হুগলী নদীগর্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

ক্রমাগত পলি অবক্ষেপণে হুগলী নদীর নাব্যতা কমে আসছে। পোর্ট কমিশনার্সের সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৯৩৮ সালে বছরে মাত্র ৭৪ দিন ২৬ ফিট ড্রাফটের জাহাজ হুগলী খাঁড়ি দিয়ে কলকাতা বন্দর পর্য্যন্ত আসতে পারত না। ১৯৫৮ সালে বছরে ৩৫৫ দিনই ঐ মাপের জাহাজ হুগলী খাতে ঢুকতে পারে নি। ১৯৬১ সালে একদিনের জন্যও অত বড় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারে নি। কৃত্রিম উপায়ে পলি কেটে সরানোর ( ড্রেজিং ) ফলে আজকাল অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু এ পদ্ধতিতে পলি সরানো খুব ব্যয়সাধ্য। ত্রিশের দশকে ড্রেজিং-এর জন্য সামান্য অর্থব্যয় করলেই চলত, কিন্তু ১৯৬০-৬৫ তে এই কাজের জন্য বাৎসরিক ব্যয় এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই কোটি টাকার মত ( ব্যানার্জী, ১৯৭২ )।

ড্রেজ করে তোলা পলি যে কোথায় ফেলা হবে সেটাও একটা সমস্যা। শিল্পনগরীর কাছে, বা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় এই বিরাট পরিমাণ পলি নদীর পাড়ে ফেলা সম্ভব নয়। পলি ফেলতে হয় নদীগর্ভেই, এমন কোনও জায়গায়, যাতে সেই পলি তৎক্ষণাৎ তার পূর্বস্থানে ফিরে না আসে। তেজস্ক্রিয় ও ফ্লুরোসেণ্ট ট্রেসারের সাহায্যে নদীগর্ভে পলি ফেলার স্থানগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা হয় বটে, কিন্তু তবুও স্রোতেরটানে সেই পলির কিছুটা অংশ আবার পূর্বস্থানে ফিরে এসে জটিলতার সৃষ্টি করে ( ঘোষ, ১৯৭২ )।

অসংখ্য বালির চরা, বাঁক, জোয়ার-ভাটাজনিত অসুবিধা ও অত্যধিক পরিমাণে পলি অবক্ষেপণ প্রভৃতি মিলে হুগলীর মোহানায় জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া ঝড়, ঝঞ্ঝা, কুয়াসা ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাব তো আছেই। এ সব কারণেই হুগলী মোহানায় জাহাজ চালাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়। মোহানা থেকে কলকাতা বন্দর পর্য্যন্ত আসতে সমস্ত জাহাজকেই অভিজ্ঞ পাইলটের সাহায্য নিতে হয়। এ সব কারণেই কলকাতা

বন্দরের প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হলদিয়াতে একটি বিকল্প বন্দরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হুগলী মোহানায় আর একটি অসুবিধা হ'ল জলে লবণের আধিক্য। কলকাতার জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করা হয় পলতার কাছের নদী থেকে। সুপেয় জলে লবণের পরিমাণ হাজারে ০.২৫ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। পলতার কাছে জল সুপেয় ছিল ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত। এই লবণের মাত্রা বাড়তে বাড়তে ১৯৬৬ সালে দাঁড়িয়েছিল হাজারে তিন ভাগের মত।

হুগলীর জলে লবণ আসে সমুদ্র থেকে, জোয়ারের জলের সঙ্গে। ভাগীরথী হুগলীতে মিঠেজলের স্রোত অব্যাহত থাকলে জলে লবণের পরিমাণ কমত, কিন্তু মিঠে জলের অভাবে সুপেয় জল সরবরাহ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষার অব্যবহিত পরে জলে লবণের মাত্রা সাময়িকভাবে কিছুটা কমে বটে, কিন্তু শীতের শেষে বা গ্রীষ্মকালে মিঠেজলের প্রবাহ কমে গেলেই জলে লবণের মাত্রা আবার বেড়ে যায়। পোর্ট কমিশনার্সের হিসাব অনুযায়ী অক্টোবর মাসে সুপেয় জলের সীমানা কলকাতার দক্ষিণে হলদিয়ার কাছে থাকে, কিন্তু এপ্রিল-মে মাসে এই সীমানা কলকাতার উত্তরে পলতা-মূলাজোড়ের কাছে এগিয়ে যায় ( চ্যাটার্জী, ১৯৭২ )।

হুগলী নদীর নাব্যতা কিভাবে বাড়ানো যায়, বা সমুদ্র থেকে আসা লবণের মাত্রা কিভাবে কমানো যায়, এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা অনেক হয়েছে। উপায় একটাই আছে—ভাগীরথী-হুগলীর খাতে মিঠে জলের স্রোতকে বাড়ানো। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ব্রিটিশ সেচবিজ্ঞানী আর্থার কটন (Arthur Cotton) এ উদ্দেশ্যে গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে কিছুটা জল ভাগীরথী-হুগলীর খাতে প্রবাহিত করে দেবার এক পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ১৯৪০ সালের আগে এ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে প্রধান প্রশ্ন হ'ল, হুগলীর নাব্যতা বাড়াতে ও লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ঠিক কতটা পরিমাণ মিঠে জল ভাগীরথী-হুগলীর খাতে প্রবেশ করানো প্রয়োজন? গাণিতিক পদ্ধতিতে এ প্রশ্নের সমাধান করা শক্ত, তাই গবেষণাগারে হুগলী মোহানার মডেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্থির হয় যে সারা বছর অন্ততঃপক্ষে ৪০,০০০ কিউসেক মিঠে জল হুগলী খাতে প্রবাহিত রাখতে পারলে দুটি সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের নদী গবেষণা কেন্দ্র (River

Research Institute) ছাড়াও পুণার গবেষণাগারে এ সম্পর্কে মডেলের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া বিশিষ্ট ডাচ্ ও জার্মান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও নেওয়া হয়েছিল।

গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীর খাতে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই ফারাক্কার কাছে গঙ্গায় ৭৪০০ ফিট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এই বাঁধের পিছনে অবস্থিত জলাধার থেকে ২৬ মাইল দীর্ঘ একটি খাল আড়াআড়িভাবে ভাগীরথীর খাতে এসে মিশেছে। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই পথেই গঙ্গার জল ভাগীরথীর খাতে এসে পড়ছে।

ফারাক্কা প্রকল্প শুরু করার পরও অনেকে অবশ্য এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ভাগীরথীর জলসমস্যা এতে মিটবে না, কারণ এতে নদীর উপরের অংশের চরগুলির পলি এসে কলকাতার কাছের নাব্যপথে জমা হবে। ডায়মণ্ড-হারবারের দক্ষিণে, হলদি নদী ও হুগলীর সঙ্গমের কাছে নদীখাত হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে যাওয়ায় জলের গতিবেগ এখানে অকস্মাৎ হ্রাস পায়। এতে যে পরিমাণ পলি অবক্ষেপিত হয়, তাকে সরানো ফারাক্কা ব্যারেজের জলের সাধ্য নয় (কপিল ভট্টাচার্য্য, ১৯৭৮)। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে শ্রী ভট্টাচার্য্য হুগলী নদীর উপর লক ও রেগুলেটিং গেট সম্বলিত দুটি ব্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাব করেছেন। এর দ্বারা হুগলী নদীখাতে জোয়ারের জলের সঙ্গে আসা পলির অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে, অথচ জাহাজ চালানো ও প্রয়োজনমত জোয়ারের জল প্রবেশ করানো যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ ও খাল খননের পরেও ভাগীরথীর খাতে জল সরবরাহ নিয়ে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এর প্রথমটি ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা, কিন্তু দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক সমস্যা, এতে ভারত ও বাংলাদেশ, উভয়েরই স্বার্থ জড়িত। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে গঙ্গায় জলপ্রবাহ থাকে গড়ে ৭২ থেকে ৮৩ হাজার কিউসেকের মধ্যে, সুতরাং তখন এর থেকে ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীর খাতে নিয়ে নিলে অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে সেচ ও শিল্পের জন্য যে হারে গঙ্গার জল নিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাতে ফারাক্কা পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ জলপ্রবাহ থাকছে না (মুন্সী, ১৯৮০)। তাছাড়া, মূল নদীখাত থেকে খাল মারফৎ জল

নিয়ে নিলে, ঔদক বিজ্ঞানের (hydrology) নিয়ম অনুসারে নদীখাতে পলি অবক্ষেপণের পরিমাণ বাড়তে বাধ্য। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে চাষের জন্য ভূ-জল ব্যবহারের একটি প্রস্তাব আছে বটে, কিন্তু ভূ-জলে নানা প্রকার লবণের আধিক্য থাকায় এ প্রস্তাব বাস্তবে রূপান্তরিত করা হচ্ছে না।

খরার মরশুমে গঙ্গার সীমিত জলপ্রবাহ থেকে ৪০,০০০ কিউসেক জল ভাগীরথী খাতে নিয়ে নিলে বাংলাদেশে জলাভাব জনিত অসুবিধা দেখা দেবে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ চুক্তিতে স্থির হয় যে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শুষ্ক ঋতুতে সর্বাধিক ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ কিউসেক জল পরীক্ষামূলকভাবে ভাগীরথী খাতে প্রবেশ করানো হবে। ঐ একই সময়ে ৩৪,৫০০ থেকে ৩৮,০০০ কিউসেক জল যাবে বাংলাদেশের ভাগে। ভাগীরথীর খাতে এত অল্প পরিমাণ জলপ্রবাহে পরিস্থিতির অবনতি হওয়াই সম্ভব, কারণ এই জলস্রোতে উপর থেকে আসা ভাসমান পলির গতি অব্যাহত থাকবে, অথচ জোয়ারের জলের সঙ্গে সমুদ্র থেকে ভেসে আসা পলি বা লবণের গতি রোধ করবার ক্ষমতা এর থাকবে না।

এসব সমস্যা আলোচনার জন্যই ১৯৮০ সাল থেকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কয়েকটি বৈঠক বসেছে, তবে ব্যাপারটি এখনও আলোচনার স্তরেই আছে, কোনও পক্ষই কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

## কলকাতার জল নিষ্কাশন সমস্যা

নাব্যতার অভাব বা জলে লবণের আধিক্য ছাড়াও কলকাতা শিল্প নগরীর আরও কয়েকটি সমস্যা ভাগীরথী-হুগলীর নদী সমস্যার সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে একটি হ'ল কলকাতা মহানগরীর পয়ঃপ্রণালীর জল নিষ্কাশন সমস্যা।

হুগলী নদীর পূব তটে, নদীর প্রাকৃতিক বাঁধের (natural levee) উপর কলকাতা নগরী অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক বাঁধের ঢাল পশ্চিম থেকে পূবে। হুগলী পাড়ের স্ট্র্যাণ্ড রোডের উচ্চতা শিয়ালদহ অঞ্চল থেকে বেশী। শিয়ালদহের পূবে নদীর প্লাবনভূমি (backswamp) অবস্থিত। সব বড় প্লাবনভূমির মত হুগলীর এই প্লাবনভূমিও পূর্বে জলাভূমি ছিল। সে সময়ে

ধাপার মাঠ হয়ে এই নিম্নভূমিতে কলকাতার ময়লাজল নিষ্কাষন করা যেত। সম্প্রতি এই নিচু জমির কিছু অংশ ভরাট করে কলকাতার পূবে সল্ট লেক উপনগরী গড়ে তোলা হচ্ছে। তাই ঐদিকে আর ময়লাজল নিষ্কাশন করা সম্ভব নয়।

হুগলী নদীতটে অবস্থিত কলকাতা নগরীর অনেকাংশের উচ্চতা জোয়ারের সময়ে হুগলী বা তার শাখানদীগুলির জলের উচ্চতা থেকে কম হওয়ায় সময়ে সময়ে সহরের পয়ঃপ্রণালীর জলনিষ্কাশন এক বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই সামান্য বৃষ্টিতে অনেক সময়েই সহরের রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। আবার ক্রমাগত পলি অবক্ষেপণে হুগলীগর্ভ উঁচু হয়ে যাওয়ায় জোয়ারের জল স্ট্র্যাণ্ড রোড ছাপিয়ে ময়দানের কিছু অংশ প্লাবিত করেছে এমন নজিরও আছে।

কলকাতার নিম্নাঞ্চল থেকে পাম্পের সাহায্যে দক্ষিণ-পূব দিকের খালে জল নিষ্কাশন করা হয়। বেশী বৃষ্টির সময় এ ধরণের কৃত্রিম ব্যবস্থায় জল নিষ্কাশনে দেরী হয়। পূর্বে কলকাতার দক্ষিণপূবের বিদ্যাধরী-মাতলার খাল এই কাজে ব্যবহার করা হতো। এই খাল বেয়ে ময়লা জল সমুদ্রে চলে যেত। কিছুকাল পূর্বেও যে এসব নদীখাতে যথেষ্ট জলপ্রবাহ থাকত তার প্রমাণ আছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে নদীগুলির খাত মজে গিয়ে জলনিষ্কাষণ ব্যবস্থা জটিল করে তুলেছে। সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত বলে জোয়ারের জলের সঙ্গে প্রচুর পলি উঠে এসে এদের খাত ভরিয়ে ফেলছে। তাছাড়া গত প্রায় দু'শ বছর ধরে এ অঞ্চলে নদীপাড়ে কৃত্রিম বাঁধ বেঁধে পতিত জমি উদ্ধারের যে ব্যবস্থা চলে আসছে তাতেও নদীখাত মজে গেছে ( মুখোপাধ্যায়, ১৯৪৮ )। কলকাতার পয়ঃপ্রণালীর জলে কঠিন পদার্থের ভাগ খুব বেশী হওয়ায় অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়েছে। সব মিলে গত কয়েক দশকে কলকাতার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে মহানগরীর প্রাকৃতিক পরিবেশও দূষিত হয়ে উঠেছে।

## দামোদর অববাহিকার সমস্যা

দামোদরের অববাহিকা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিস্তৃত। এ অববাহিকার মোট আয়তন ২৪,২৩৫ বর্গ কিলোমিটার। দামোদর নদের দৈর্ঘ্য

৫৪১ কিলোমিটার ( প্রায় ৩৩৬ মাইল )। ছোটনাগপুর অঞ্চলে দামোদরের উৎপত্তিস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু' হাজার ফিট উঁচু। প্রথম ১৫০ মাইলে এ অঞ্চলের ঢাল গড়ে মাইলপ্রতি ১০ ফুট। পরের ১০০ মাইলে ঢাল মাইলপ্রতি তিন ফুট। পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর নদীটি প্রায় সমতলভূমি দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শেষ ৯০ মাইলে ঢাল গড়ে মাত্র মাইলপ্রতি এক ফুটের মত।

দামোদর অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিমাণ গড়ে ৪৬·৫ ইঞ্চি। এই বৃষ্টির প্রায় সবটাই পড়ে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। উৎপত্তি স্থানের কাছে বিরাট অঞ্চল জুড়ে অনুর্বর, রুক্ষ, উদ্ভিদশূন্য জমি থাকায় বর্ষার সময়ে দ্রুত জমির ক্ষয় থেকে প্রচুর পরিমাণে পলির সৃষ্টি হয়। এই পলি নদীর জলবাহিত হয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিবাহিত হয় বটে, কিন্তু নদীখাতের ঢালের দ্রুত পরিবর্তনের জন্য এর অনেকটাই আবার সমতলভূমির মুখে অবক্ষেপিত হয়ে জল নিষ্কাশনে বাধার সৃষ্টি করে। অত্যধিক হারে পলি অবক্ষেপণ দামোদর অববাহিকার অন্যতম প্রধান সমস্যা। আর একটি সমস্যা হল জলপ্রবাহের অনিশ্চয়তা।

১৯৩২-৪৮ সালের গড় হিসাব অনুসারে, দামোদর নদে ১১,১০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হতো ( রাণ্ডিয়ায় নেওয়া হিসাব )। বর্ষায় জলপ্রবাহ ১২৮,৩০০ কিউসেকে উঠলেও গ্রীষ্মে নদীখাতে জলপ্রবাহ প্রায় থাকত না বললেই চলে। জলপ্রবাহের এই তারতম্যের জন্য বর্ষায় যে বিপুল পরিমাণ পলি নদীর উৎপত্তি স্থান থেকে ধুয়ে আসত, তার অনেকটাই সমতলভূমির মুখে, নদীগর্ভে অবক্ষেপিত হতো। ভরাট নদীখাত বর্ষার জলস্রোত নিষ্কাশণ না করতে পারলেই হতো বন্যা। এ কারণেই বহুবার এ নদীতে বন্যা হয়েছে। ১৯১৩, ১৯২৭, ১৯৩৫ ও ১৯৪৩এ দামোদর উপত্যকায় ভয়াবহ বন্যার নজির আছে।

বন্যা প্রতিরোধের উপায় হিসাবে বহুবার দামোদরের নদীপাড় বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ইংরাজ আমলের আগেই দামোদরের বাম পাড় বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। ইংরাজ আমলে রেলপথের জন্য নদীপাড় বরাবর দ্বিতীয় বাঁধ ও পরে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় বাঁধ দেওয়া হয়। আরও পরে, সেচ ব্যবস্থার জন্য নির্মিত ইডেন খালের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

দুটি বাঁধ দেওয়ায় দামোদরের বাম তীরে মোট পাঁচটি বাঁধের সৃষ্টি হয় ( ঘোষ, ১৩৬৫ )।

নদীপাড় বরাবর বারবার বাঁধ দেওয়ায় দামোদর অববাহিকার উন্নতির বদলে সামগ্রিক অবনতিই হয়েছে। জলস্রোতে ভাসমান পলি বাঁধ অতিক্রম করে প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারায় প্লাবনভূমির উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে এই পলি নদীগর্ভে থিতিয়ে পড়ে নদীগর্ভকে অগভীর করে তুলেছে। তাছাড়া বহুকাল থেকেই নদীপাড়ের বাঁধ কেটে খাল মারফৎ সেচের জন্য জল নেবার যে পদ্ধতি চলে এসেছে, তাতেও নদীখাতের জলপ্রবাহ কমে গিয়ে পলি অবক্ষেপণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলেই দামোদর উপত্যকা, বিশেষ করে নিম্নাঞ্চল, বারবার বিধ্বংসী বন্যার কবলে পড়েছে। ১৯১৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪৩ সালের বন্যায় দামোদরের সর্বাধিক জলস্রোত ৬৫০,০০০ কিউসেকের কাছাকাছি উঠেছিল [ ৯-খ চিত্র ]। ১৯৪৩ সালের বন্যা এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার এক বিরাট অঞ্চল প্লাবিত হয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে পশ্চিমদিকের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সেচ বিশেষজ্ঞেরা ও ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বহুদিন যাবৎ দামোদর প্রভৃতি নদী অববাহিকার সামগ্রিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন ( সাহা, ১৯৩৮ )। ১৯৪৩ সালের বন্যার পর তৎকালীন বাংলা সরকার "দামোদর বন্যা অনুসন্ধান কমিটি" নিযুক্ত করেন। দশ সদস্যের এই কমিটিতে প্রশাসক ও বন্দরবিশেষজ্ঞ ছাড়াও বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা ও ঔদক বিজ্ঞানী ডঃ নলিনীকান্ত বোসও সদস্য ছিলেন। এঁরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনার অনুকরণে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রস্তাব তোলেন। ফলে ১৯৪৬ সালে দামোদর পরিকল্পনার জন্ম হল। টেনেসী পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ ভুডউইন (W. L. Voorduin) পরিকল্পনার পরামর্শদাতা নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৮ সালে, স্বাধীন ভারতবর্ষে, শ্রীনেহেরুর বিশেষ উৎসাহে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের ( সংক্ষেপে ডি. ভি. সি ) কাজ সুরু হল। ১৯৫৯ সালের মধ্যেই দামোদর ও বরাকর নদীর উপর চারটি বড় বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এগুলি হল মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া ও কোনার। দামোদর উপত্যকার

বাঁধগুলি বহু উদ্দেশ্যসাধক (multipurpose)। উপরিউক্ত চারটি জায়গায় নদীর উপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ নির্মাণ করে গেটের সাহায্যে নদীর জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। বাঁধের পিছনের জলাধারে বন্যার সময়ে যে বিপুল পরিমাণ জল সঞ্চিত হয়, তার সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা হল। এছাড়া ডি ভি সি পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থা, নৌ চলাচল ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, জমির ক্ষয় নিবারণ, প্রভৃতির ব্যবস্থাও ছিল। ১৯৫৯ সালের মধ্যেই সেচের জন্য জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদীর উপর বাঁধ ও দুর্গাপুরে দামোদরের উপরে ব্যারেজও নির্মিত হয়।

মূল দামোদর পরিকল্পনায় মোট আটটি ( প্রথমে দশটি ) বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল, শেষ পর্যন্ত নির্মিত হয় মাত্র চারটি। তবুও এই বহুমুখী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি যে বহুলাংশে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নির্মিত চারটি বাঁধ-জলাধারের মোট জলধারণ ক্ষমতা ১২৮৪ মিলিয়ন কিউবিক মিটার ( ১০ মিলিয়ন=১ কোটি )। এর মধ্যে মাইথন ও পাঞ্চেৎ-এর বড় বড় জলাধার দুটিই ১০৫০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার জল ধরে রাখতে সক্ষম। এই বাঁধ ও জলাধারের জন্যই দেশের পূর্বাঞ্চল কয়েকবার বড় আকারের বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১৯৫৮ সালের পর এই অঞ্চলে বিধ্বংসী বন্যা আর হয় নি বললেই চলে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের দামোদর বন্যায় জলপ্রবাহের মাত্রা ১৯১৩ বা ১৯৩৫-এর বন্যার তুলনায় অনেক কম ছিল ( বোস ও সিংহ, ১৯৬৪ )। ১৯৭৮ সালে অবশ্য বিশেষ কয়েকটি প্রাকৃতিক যোগাযোগের ফলে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ আর একবার বন্যা কবলিত হয়। সে কথা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও, ডি ভি সি প্রকল্পে সেচ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলার যে অঞ্চলটি এই সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে, ডি ভি সি প্রকল্পের আগে সেখানে মাত্র ৮১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সেচখালের অস্তিত্ব ছিল। ১৯৫৫ সালে দুর্গাপুর প্রকল্পের জন্মের সাথে সাথেই ডি ভি সি সেচ পরিকল্পনারও সূত্রপাত হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের অধীন খালের মোট দৈর্ঘ্য ২৪৯৫ কিলোমিটার। ১৯৭৯-৮০ সালে মোট ৩.২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে খারিফ শস্যের জন্য ও ০.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে

রবি শষ্যের জন্য জলসেচ করা হয়েছে। প্রাক্ ডি ভি সি কালে মাত্র ০.৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষের জন্য জল সরবরাহ করা যেত।

মাইথন ( ৬০ মেগাওয়াট ), পাঞ্চেৎ ( ৪০ মেগাওয়াট ) ও তিলাইয়া ( ৪ মেগাওয়াট ) জলাধারে উৎপন্ন জলবিদ্যুত ছাড়াও ডি ভি সি মোট ১২৫৭.৫ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে ( বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুর তাপ প্রকল্পের সম্মিলিত উৎপাদন )। ১৯৭৯-৮০ সালে ডি ভি সি কর্তৃক মোট জল ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। ডি ভি সি বিদ্যুৎ সরবরাহের এলাকা পূবে কলকাতা মহানগরী, পশ্চিমে বিহারের হাজারীবাগ-বাহরী, উত্তরে সুলতানগঞ্জ ও দক্ষিণে জামসেদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বিদ্যুৎ ছাড়াও, ১৯৭৯-৮০ সালে শিল্প ও পারিবারিক চাহিদা মেটাতে ডি ভি সি ১৭১,৬৮৯ মিলিয়ন লিটার জল সরবরাহ করেছে। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই সরবরাহের পরিমাণ ছিল আরও বেশী ( ২১,৮৬২৯ মিলিয়ন লিটার )। এই জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ গ্রহণ করেই গত বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে পূর্বভারতে বিরাট শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে ও বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ডি ভি সি উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যেই সমগ্র ভারতবর্ষের শতকরা সত্তরভাগ কয়লা উত্তোলিত হয়। দুর্গাপুর অঞ্চলের সমস্ত কলকারখানা ছাড়াও দেশের পাঁচটি বড় বড় ইস্পাত কারখানা ও সমগ্র পূর্বভারতের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ বিশেষভাবে ডি ভি সির বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপরেই নির্ভরশীল ( ডি ভি সি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য )।

পরিকল্পিত উপায়ে নদী শাসন করলে একটি নদী অববাহিকা থেকেই যে সেচ ও শিল্প ব্যবস্থার কতটা উন্নতি করা সম্ভব, ডি ভি সির দৃষ্টান্ত থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে এ ধরণের নদীশাসন পদ্ধতিতে শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ে। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনায় সমগ্র পূর্বাঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য যে কিভাবে ব্যাহত হয়েছে, নিচের আলোচনা থেকেই তা স্পষ্ট হবে।

বাঁধ দেবার পরেই দামোদর উপত্যকার নদীগুলিতে যে সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হ'ল অত্যাধিক হারে পলি অবক্ষেপণ। বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ও শিল্পের জন্য জল সরবরাহ প্রভৃতি

কাজে প্রতিটি বাঁধের জলাধারে জল ধরে রাখা অত্যাবশ্যক, তাই দামোদরের মত অস্থায়ী (ephemeral) প্রবাহের নদীখাতে সারা বছর জল সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। খরার মরসুমে দামোদরের খাতে জলপ্রবাহের পরিমাণ এত কমে যায় যে পলি অপসারণের ক্ষমতা তার আর থাকে না। এই অবস্থায় নদীবাহিত সমস্ত পলিই নদীগর্ভে অবক্ষেপিত হয়।

শিল্পোন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে সমগ্র দামোদর উপত্যকায় গত বিশ বছরে ব্যাপক হারে বনসম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে। এর ফলে ভূমির অবক্ষয় বেড়ে শুধু নদীখাতেই নয়, বাঁধের জলাধারেও পলি অবক্ষেপণ এক ভয়াবহ স্তরে পৌঁছেছে। নিচে দামোদর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী জলাধারে পলি অবক্ষেপণের হার দেওয়া হ'ল। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই জলাধারগুলির মোট আয়তনের কতটা পরিমাণ পলিতে ভর্তি হয়ে গেছে এতে তার হিসাব পাওয়া যাবে ( গুপ্ত, ১৯৭৭ )।

| বাঁধ জলাধার | শুরু হবার সময় | বাৎসরিক পলি অবক্ষেপণের হার* | | ১৯৭৫ পর্যন্ত জলধারণ ক্ষমতা কতটা কমে গেছে | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | আনুমানিক | নিরীক্ষিত | মোট পরিমাণ (%) | বাৎসরিক পরিমাণ (%) |
| পাঞ্চেৎ | ১৯৫৬ | ২ ৪৭ | ১০.০০ | ১২.৪০ | ০.৬৫ |
| মাইথন | ১৯৫৬ | ১.৬২ | ১৩.১০ | ১০.০৬ | ০.৫০ |
| ময়ূরাক্ষী | ১৯৫৫ | ৩.৬১ | ১৬.৫৬ | ১০ ২৪ | ০.৫০ |
| কংসাবতী | ১৯৬৫ | ৩.২৭ | ৩.৭৬ | ১.৪০ | ০.১৩ |

* প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে হেক্টর মিটারের হিসাব।
(ha m/100 Sq. Km)

উপরের তথ্য থেকেই বোঝা যাবে যে কি ব্যাপক হারে বাঁধ সন্নিহিত জলাধারগুলিতে পলি অবক্ষেপণ হচ্ছে। পাঞ্চেৎ মাইথন ও ময়ূরাক্ষী জলাধারের শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ পলিতে পূর্ণ হয়ে গেছে গত পঁচিশ

বছরের মধ্যেই। উপরের হিসাব থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে হারে জলাধারগুলিতে পলি অবক্ষেপণ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে হয়েছে তার অনেকগুণ বেশী হারে। এ থেকে মনে হয় যে বাঁধ নির্মাণের পরে নদী সংলগ্ন অঞ্চলে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠলে যে কি ব্যাপক হারে অরণ্যসম্পদ ধ্বংস হয়ে ভূমির অবক্ষয়কে বাড়িয়ে দেবে, নদী বিশেষজ্ঞেরা তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

জলাধারগুলির পলি অপসারণ নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছে, কিন্তু কারিগরী দিক থেকে এত বড় বড় জলাধারে পলি অপসারণ করা সহজ নয়, অত্যন্ত ব্যয়বহুল তো বটেই। ড্রেজার দিয়ে পলি অপসারণ করলে সে পলি কোথায় ফেলা যাবে সেটাও একটা সমস্যা। জলাধারের পাড়ে জমা করলে সে পলি বর্ষার জলে ধুয়ে আবার জলাধারে পড়বার আশঙ্কা থেকে যায়।

সম্পূর্ণভাবে বাঁধ খুলে জলের তোড়ে পলি ধুইয়ে বার করে দেওয়া (flushing) হয়তো সম্ভব, কিন্তু এতে জীবন ও সম্পত্তি হানির আশঙ্কা আছে, কারণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে জনবসতি নদীখাতের খুবই কাছে সরে এসেছে। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে জলাধারের পলি এত শক্ত হয়ে গেছে যে না কেটে তা অপসারণ করা সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৪৮-৪৯ সালে দামোদর উপত্যকা কমিশন যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করছিলেন তখন কপিল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ইঞ্জিনীয়ারেরা বার বার এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে দামোদরের স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করলে কলকাতা বন্দরের ধ্বংস অনিবার্য্য। এঁদের মতে দামোদরের বন্যাই জোয়ারের জলবাহিত পলিকে ঠেকিয়ে রেখে হুগলী মোহানার নাব্যতা রক্ষা করে। শ্রীভট্টাচার্য্য অবশ্য এ কথা বলেন নি যে দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় বন্যা নিরুদ্ধ করলে হুগলী মোহানার নাব্যতা রক্ষার কোনও উপায়ই নেই। তাঁর মত ছিল যে নিম্ন উপত্যকায় দামোদরের মূল খাত দিয়ে সারা বছরই জলস্রোত প্রবাহিত রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আর প্রয়োজন রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি মজে যাওয়া খাতের সংস্কার করা (ভট্টাচার্য্য ১৯৫৯, পৃঃ ৫১-৫৫)। দামোদর পরিকল্পনায় নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে জলাধারে জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত নিম্ন দামোদরের খাত সম্পূর্ণ মজে যাওয়ায় সারা বছর যথেষ্ট

পরিমাণ জল প্রবাহিত করা যাচ্ছে না। শ্রীভট্টাচার্য্য দেখিয়েছিলেন যে ১৯০১-২ সালে রূপনারায়ণের উপর নির্মিত রেলসেতুটি জলস্রোতকে ব্যাহত করে পলি অবক্ষেপণ ঘটানোয় নদীর খাত মজে এসেছে। এ কারণেই কোলাঘাটের কাছে নদীগর্ভে থাম পুঁতে রূপনারায়ণের উপর দ্বিতীয় সড়ক সেতু নির্মাণে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। সে আপত্তি অগ্রাহ্য করেই দ্বিতীয় সেতুটি নির্মিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রূপনারায়ণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জোয়ারের জল রূপনারায়ণের খাতে ছড়িয়ে পড়ায় হুগলী নদীর প্রধান খাতটি জোয়ার বাহিত পলির থেকে অনেকটা রক্ষা পায়। তা ছাড়া মুণ্ডেশ্বরী ও অন্যান্য ছোট ছোট শাখানদী বেয়ে বন্যার জল রূপনারায়ণের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে বেরিয়ে যায় বলে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের এক বিরাট অঞ্চল প্লাবনের হাত থেকে বাঁচে।

কলকাতা পোর্ট কমিশনার্সের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণের পর নদীগর্ভে অত্যধিক মাত্রায় পলি অবক্ষেপণে রূপনারায়ণের জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে আসছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে এই ক্ষমতা কমেছে শতকরা একভাগ হারে ; আর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে কমেছে শতকরা দু'ভাগ হারে। রূপনারায়ণের জলধারণ ক্ষমতা কমে গেলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে তার কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, ১৯৭০ সালের এক বক্তৃতায় ঔদক বিজ্ঞানী ডঃ নলিনীকান্ত বোস তা আলোচনা করেন ( বোস, ১৯৭২ )। তাঁর মতে এর ফলে (১) হুগলী নদীতে মিঠে জলের স্রোত কমে যাওয়ায় নদীর নাব্যতা কমবে ও জোয়ারের প্রভাবে জলে লবণের ভাগ বাড়বে। (২) নিম্ন দামোদর ও দ্বারকেশ্বর অঞ্চলে বন্যার জল নিষ্কাশনে দেরী হবে। ফলে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে বন্যার সম্ভাবনা বাড়বে। (৩) রূপনারায়ণ, শিলাবতী, পলাশপাই ও দূর্বাচটি খাল পরিবেষ্টিত দাসপুর অঞ্চলে বন্যার সম্ভাবনা বাড়বে।

ডঃ বসুর আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয় ১৯৭৮ সালের এক বিধ্বংসী বন্যায়। সে কথা নিচে আলোচনা করা হল।

## ১৯৭৮ সালের বিধ্বংসী বন্যা

১৯৭৮ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে পর পর তিনবার বন্যা হয়। এ বন্যায় কেবলমাত্র মালদার পশ্চিম অংশ ও পুরুলিয়া ছাড়া সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ যে ভাবে জলপ্লাবিত হয়, স্মরণীয় কালে তার কোনও নজীর নেই।

এ বন্যার শুরু ১৯৭৮ সালের আগষ্ট মাসে। প্রথম বন্যাতেই গঙ্গা ও পদ্মার জলে মুর্শিদাবাদ ও মালদার অনেক জায়গা প্লাবিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে, মুর্শিদাবাদ ও মালদা যখন দ্বিতীয়বার বন্যার কবলে, তখন নিম্নচাপ জনিত অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলে মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীর বিরাট এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়ে যায়। উড়িষ্যার উপকূলে, বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত এই নিম্নচাপকেন্দ্রটি মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুর ঘুরে ২৭শে সেপ্টেম্বর আসানসোলের কাছে ঘূর্ণিঝড় রূপে দেখা দেয়, পরে দক্ষিণ-কাঁথির দিকে সরে যায়। এর ফলে, কলকাতা ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে শতাব্দীর প্রবলতম বৃষ্টিপাত হয়। ২৭ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭৬ সেণ্টিমিটার। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দৈনিক ২ সেণ্টিমিটারের বেশী নয়।

ডি ভি সির হিসাবে প্রকাশ যে ঐ বৃষ্টিপাতের ফলে ২৬।২৭ সেপ্টেম্বর মধ্য-রাত্রিতে সাড়ে আট লক্ষ কিউসেক জল চারিদিক থেকে বাঁধ-সংলগ্ন জলাধারে জমা হয়। ইতিপূর্বে কখনও একসঙ্গে এত পরিমাণ জল ডি ভি সি জলাধারে প্রবেশ করে নি। ঐ সময়ে সমগ্র দামোদর অববাহিকায় একই সঙ্গে বৃষ্টি হওয়ায় এর সঙ্গে মিলেছিল আরও প্রায় আড়াই লক্ষ কিউসেক জল। এর ফলে ডি ভি সি পাঞ্চেৎ ও মাইথন জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণ জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, তবে কোনও সময়েই জলপ্রবাহের পরিমাণকে ১.৬০ লক্ষ কিউসেক অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি ( ডি ভি সি-কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য )। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবস্থিত দামোদরের নিম্নখাতগুলি সম্পূর্ণ মজে থাকায় এই বিপুল জলস্রোত নদীখাত বেয়ে সাগরে নিষ্কাশিত হতে পারে নি। এরই ফলে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ জলপ্লাবিত হয়ে যায়। একই সময়ে হুগলী মোহানায় বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ষাঁড়াষাঁড়ি বানের উর্ধ্ব চাপও জলস্রোত নিষ্কাশনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে বন্যা

ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ডি ভি সির বাঁধগুলি না থাকলে বন্যা যে আরও ব্যাপক হতো তাতে সন্দেহ নেই, তবে জলাধারগুলির আকার আরও বড় হলে, বা অত্যাধিক পলি অবক্ষেপণে সেগুলি অংশত ভর্তি না থাকলে বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমানো যেতো।

## উপসংহার

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণগুলি সংক্ষেপে এইরকম দাঁড়ায় ঃ

(১) দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পাড় বরাবর বারবার বাঁধ নির্মাণ করার ফলে প্লাবনভূমিতে (flood basin) নদী বাহিত পলি ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এর ফলে নদীগর্ভে পলি থিতিয়ে পড়ে এ অঞ্চলের সমস্ত নদীখাতকে অগভীর করে তুলেছে। প্রায় একশ বছর আগে সেচ বিশেষজ্ঞ আর্থার কটন (Arthur Cotton) বলেছিলেন যে রেলপথের জন্য নদীপাড় বরাবর নির্মিত কৃত্রিম বাঁধ এদেশের প্রাচীন সেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেবে। বিশের দশকে উইলিয়ম উইলকক্স নানা যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন যে নদীপাড় বরাবর কৃত্রিম বাঁধ তৈরী করায় পলি অবক্ষেপণের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে প্লাবনের সম্ভাবনা বাড়ছে। এর পরও অনেক ঔদক বিজ্ঞানী ও নদী বিশেষজ্ঞ কৃত্রিম বাঁধ ও সেতু নির্মাণের জন্য নদীগর্ভে থাম পুঁতে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহে বাধা সৃষ্টির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অথবা অন্য কোনও কারণে এ সব সতর্কবাণী উপেক্ষিত হয়েছে। এর ফলে অত্যধিক পলি অবক্ষেপণে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নদীখাতই মজে এসেছে।

(২) ডি ভি সি প্রকল্পে বরাকর, দামোদর প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধারে বাড়তি জল ধরে রাখায় বন্যার প্রকোপ কমেছে বটে, কিন্তু জলাধার-গুলিতে সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জল সঞ্চয় করে রাখা অত্যাবশ্যক হওয়ায় এতে অসুবিধাও দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ এতে নিম্নাঞ্চলের নদীখাতে সারা বছর জলপ্রবাহ অব্যাহত রাখা যাচ্ছে না। অথচ নদীগর্ভে পলি অপসারণের জন্য এটা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ জলাধারগুলিতে

যথেষ্ট স্থান না থাকায় অতিবৃষ্টি জনিত অতিরিক্ত জল এইসব জলাধারে ধারণ করা যায় না। অতিবৃষ্টির সময় বাড়তি জল নদীর নিম্নখাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, কিন্তু ঐ সময় নদীখাত পলিতে ভর্তি থাকায় এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয় বন্যা।

(৩) ডি ভি সির সহজলভ্য বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাকে কেন্দ্র করে নদী অববাহিকায় ব্যাপক হারে কল কারখানা ও নানা শিল্প গড়ে ওঠায় বনসম্পদ ধ্বংস হয়েছে। এতে ভূমির অবক্ষয় বেড়ে গিয়ে বাঁধ সংলগ্ন জলাধারে পলি অবক্ষেপণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাধারগুলির জীবন ও কর্মক্ষমতাও কমে আসছে।

(৪) বন্যা নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শিল্প ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় জনবসতি ক্রমে ক্রমে নদীখাতের কাছে সরে এসেছে। জনবৃদ্ধির চাপে নদীপাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে প্লাবনভূমির নিচু জমি উদ্ধারের প্রবণতাও বেড়েছে। তাই আজকাল সামান্য বন্যাতেই জীবন ও ধনসম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। প্লাবন ও জীবনহানির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে ডি ভি সি প্রকল্পের বাঁধগুলির গেট সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে জলের তোড়ে নদীখাতের পলি ধুইয়ে বের করে দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

(৫) মূল দামোদর পরিকল্পনায় দশটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু পরে তা কমিয়ে আটটি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্মিত হয়েছে চারটি। জলাধারগুলির যে আয়তন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে তার থেকে অনেক কম আয়তনের জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে দামোদর-বরাকর উপত্যকায় ১০০০ বছর পৌনঃপুনিকতার (recurrence frequency) বন্যার পরিমাণ ধরা উচিত দশ লক্ষ কিউসেক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইচ্ছা ছিল যে "তখন পর্য্যন্ত ( পঞ্চাশের দশক ) যতবড় বন্যার পরিমাণ জানা আছে ( অর্থাৎ ৬৫০,০০০ কিউসেক ), সেটাকে কমিয়ে নিম্ন দামোদরের বহন ক্ষমতায় (১৫০,০০০ কিউসেকে ) আনতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন।" জলাধার নির্মাণের সময় ডি ভি সি-কর্তৃপক্ষ এই মতই গ্রহণ করেছিলেন ( দেবেশ মুখার্জী, ১৯৭৮ )।

(৬) ভাগীরথী-হুগলীর খাতে অত্যধিক পলি অবক্ষেপণ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদীগুলির জলনিষ্কাশনের পক্ষে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এই খাতে সারাবছর

অন্ততঃ ৪০,০০০ কিউসেক জলপ্রবাহ না রাখলে পশ্চিমবঙ্গের নদী সমস্যার সামগ্রিক সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে ৪০,০০০ কিউসেক জলপ্রবাহে সে সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হবে কিনা, তা নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

(৭) ১৯৭৮ সালের বন্যার মূল কারণ বিশেষ কয়েকটি প্রাকৃতিক যোগাযোগ। অল্প সময়ে অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃস্টিপাত, একই স্থানে বন্যার পুনরাবৃত্তি, ডি ভি সি জলাধারের সীমিত আয়তন, মজে যাওয়া নদীখাত, প্রভৃতি অনেক কিছুই এই বিধ্বংসী বন্যার পিছনে কাজ করেছে। নিম্নচাপ ও ঘূর্ণীঝড়জনিত প্রবল বৃষ্টিপাতকে রোধ করবার কোনও উপায় অবশ্য এখনও মানুষের জানা নাই, তবে নিম্নাঞ্চলের সমস্ত নদীখাতকে সংস্কার করে সারা বছর জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখলে বন্যার প্রকোপ অনেকটা কমানো যেতে পারে। বাঁধ সংলগ্ন জলাধারগুলির সংস্কার করে তাদের পলিমুক্ত করেও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। বৃক্ষরোপণ ও অন্যান্য উপায়ে উচ্চভূমিতে ভূমিক্ষয় নিরোধের ব্যবস্থা দ্বারাও জলাধারে ও নদীগর্ভে পলি অবক্ষেপণের হারে কিছুটা কমানো যেতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে লোকালয়গুলি স্বভাবতঃই নদীপাড়ের দিকে সরে আসে, কিন্তু এই জনবসতি যাতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহপথে অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

জীবনধারণ ও অন্নসংস্থানের জন্য প্রতি মানুষের যেমন জল ও বাতাস ছাড়াও কিছুটা জমি দরকার, নদীরও তেমনি দরকার তার প্রবাহের পথে একখণ্ড সুনির্দিষ্ট ভূমির। অববাহিকার জল ও পলিতে পুষ্ট হয়ে নদী তার স্বাভাবিক সর্পিল ভঙ্গীতে এগিয়ে চলে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে। চলার পথে নদীর এপাড় ভাঙ্গে, ওপাড় গড়ে। বন্যার সময়ে নদী তার দুকূল উপছে প্লাবনভূমিতে জল ও পলি ছড়িয়ে তার উচ্চতা ও উর্বরতা বাড়িয়ে তোলে। নদীর জল সমুদ্রে মেশে, আবার সেই জল মেঘ, বৃষ্টি ও তুষারের মাধ্যমে স্থলভাগের উপর ফিরে এসে নদীর রূপ নেয়।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই এই আবর্তনচক্র প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে আসছে। সাময়িক লাভের আশায়, নদী শাসনের নামে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই ভারসাম্যকে বিপর্য্যস্ত করলে প্রকৃতির রুদ্ররোষে যে মানুষের ভবিষ্যতই অনিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে, একথাটা উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

# পরিশিষ্ট

## জলপ্রবাহের পরিমাণ

জলপ্রবাহের পরিমাণ কিউসেক (Cusec বা প্রতি সেকেণ্ডে কত ঘনফুট জল প্রবাহিত হয়), অথবা কিউমেক (Cumec, প্রতি সেকেণ্ডে কত ঘন-মিটার জল প্রবাহিত হয়) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা নদীর জলপ্রবাহের পরিমাণ প্রকাশ করা যায়ঃ $Q=A.V.$

$Q$=জলপ্রবাহের পরিমাণ (discharge), $A$=নদীখাতের তির্যকছেদের ক্ষেত্রফল (cross-sectional area), $V$=জলের বেগ (velocity)

নদীখাতের প্রস্থ ও জলের গভীরতার গুণফল দ্বারা তির্যকছেদের ক্ষেত্রফল (A) প্রকাশ করা হয়। সচরাচর নদীখাতের প্রস্থের কোনও পরিবর্তন হয় না। সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট নদীখাতে (যার প্রস্থ জানা আছে), জলের গভীরতা ও বেগ জানা থাকলে উপরের সূত্র থেকে জলপ্রবাহের পরিমাণ বের করা যায়।

## জলে ভাসমান পলির পরিমাপ

জলপ্রবাহের পরিমাণের সঙ্গে জলে ভাসমান পলির পরিমাপ নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়ঃ $M=K.Q^n.$

$M$=ভাসমান পলি প্রবাহের হার (rate of sediment movement),
$Q$=জলপ্রবাহের পরিমাণ (discharge) ; $n$, $k$=ধ্রুবক,

এই সূত্র দ্বারা বোঝা যায় যে জলপ্রবাহের পরিমাণ সামান্য বাড়লেই পলিপ্রবাহের হার অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

## নদীজলের স্থৈতিক শক্তি (potential energy)

নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা নদীর দুটি অংশের মধ্যে জলের স্থৈতিক শক্তি (Ep) প্রকাশ করা যায়ঃ $E_p=W.Z.$

$W$=জলের ওজন, $Z$=নদীর যে দুটি অংশের মধ্যে স্থৈতিক শক্তির হিসাব করা হচ্ছে, সে দুটি স্থানের জলের উচ্চতার মধ্যে পার্থক্য (head)।

## জলপ্রবাহের গতিয় শক্তি (Kinetic energy)

নদীর জলের মধ্যে যে স্থৈতিক শক্তি সঞ্চিত থাকে, জল প্রবাহিত হলে

তা গতিয় শক্তিতে ($E_K$) রূপান্তরিত হয়। গতিয় শক্তি নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায় ঃ

$$E_K = \frac{MV^2}{2}$$

M=জলের ভর (mass), V=জলপ্রবাহের বেগ (velocity)

**রেনল্ডস সংখ্যা (Reynolds number)**

বিশেষ কোনও জলপ্রবাহ স্তরাকৃতি (laminar) বা উত্থাল (turbulent) হবে কি না, তা স্থির হয় বিজ্ঞানী রেনল্ডস্ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা ঃ

$$N_R = \frac{V.R.\rho}{\mu}$$

V=জলপ্রবাহের বেগ (velocity), R=hydraulic radius, নদীর তির্যকছেদের ক্ষেত্রফল (cross-sectional area) ও সংপৃক্ত অংশের দৈর্ঘের বা পরিসীমার (wetted perimeter) ভাগফল সূচিত করে।

$\rho$=জলের ঘনত্ব (density), $\mu$=জলের সান্দ্রতা (viscosity)

$N_R$ সংখ্যাটি বিজ্ঞানীদের কাছে রেনল্ডস্ সংখ্যা নামে পরিচিত। এই সংখ্যাটি ৫০০-র কম হলে জলপ্রবাহ স্তরাকৃতি হয় ও ৫০০-র বেশী হলে স্রোত উত্থাল হয়।

**ফ্রুদ সংখ্যা (Froude number)**

কোনও জলপ্রবাহ উচ্চ বা নিম্ন পর্য্যায়ে আছে কিনা ( ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য ), তা বোঝা যায় বিজ্ঞানী ফ্রুদ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা ঃ

$$F = \frac{V}{\sqrt{g.D}}$$

V=জলস্রোতের গড় বেগ (mean velocity), g=অভিকর্ষজনিত ত্বরণ (acceleration due to gravity), D=জলের গভীরতা (depth of water), F=ফ্রুদ সংখ্যা (Froude number)।

ফ্রুদ সংখ্যাটি (F) একের কম হলে স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত

হয় (streaming)। এ ধরণের স্রোতকে নিম্ন পর্যায়ের স্রোতপ্রবাহ বলে (lower flow regime)। ফ্রুদ সংখ্যাটি একের বেশী হলে জলস্রোত তীব্র বেগে ছুটে চলে (shooting)। এ স্রোতপ্রবাহকে উচ্চ পর্যায়ের প্রবাহ বলে (upper flow regime)।

**Chézy ও Manning সূত্র**

জলপ্রবাহের সঙ্গে নদীখাতের আয়তন, ঢাল ও নদী সংস্তরের পললকণার প্রকৃতির সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কগুলি নিম্নোক্ত সূত্র দুইটি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। সূত্র দুইটির উদ্ভাবক Chézy ও Manning-এর নাম অনুসারেই এদের নামকরণ করা হয়েছে ঃ

Chézy সূত্র ঃ $V=C\sqrt{RS}$

Manning সূত্র ঃ $V=\frac{1{\cdot}49}{n}R^{\frac{2}{3}}.S^{\frac{1}{2}}.$

V=জলস্রোতের বেগ (velocity), R=Hydraulic radius (রেনল্ডস্ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), S=নদীখাতের ঢাল (slope), C=ধ্রুবক (gravity, friction force, roughness প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল)

n=roughness factor (নদীসংস্তরের পললকণার আকার, আয়তন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে)

নদীখাত ও নদীসংস্তরের পললকণার প্রকৃতি জানা থাকলে এই সূত্রগুলির সাহায্যে জলস্রোতের গতি অনুমান করা যায়। আবার জলস্রোত ও অন্য পরিমাপগুলি কিছু কিছু জানা থাকলেও বাকি পরিমাপগুলি অনুমান করা চলে।

## ভূতাত্ত্বিক সময়ের বিভাগ (Division of Geological time)

টার্শিয়ারী (Tertiary), ইয়োসিন (Eocene), প্রভৃতি কথাগুলির দ্বারা পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগকে বোঝায়। ভূবিদেরা পৃথিবীর জন্মকাল থেকে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগের এক একটি বিশেষ নাম দিয়েছেন। নিচেকার তালিকায় এই ভাগগুলি ও সময়ের মাপকাঠিতে তাদের বিস্তার দেখানো হয়েছে। এর থেকে প্রত্যেকটি ভূতাত্ত্বিক যুগের বয়স, কোটিবছরের হিসাবে পাওয়া যাবে।

| | | | কোটি বছরের হিসাবে বয়স |
|---|---|---|---|
| CENOZOIC কেইনো জোইক | QUATERNARY কোয়াটার্নারী | Holocene হলোসিন | |
| | | Pleistocene প্লাইস্টোসিন | ·১৫—·৩৫ |
| | TERTIARY টার্শিয়ারী | Pliocene প্লাইওসিন | ০·৭ |
| | | Miocene মাইওসিন | ২·৬ |
| | | Oligocene অলিগোসিন | ৩·৭—৩·৮ |
| | | Eocene ইয়োসিন | ৫·৩—৫·৪ |
| | | Paleocene প্যালিওসিন | ৬·৪—৬·৫ |
| MESOZOIC মেসোজোইক | CRETACEOUS ক্রেটেশাস | | |
| | JURASSIC জ্যুরাসিক | | |
| | TRIASSIC ট্রায়াসিক | | ২২·৫ |
| PALAEOZOIC প্যালিওজোইক | PERMIAN পারমিয়ান | | |
| | CARBONIFEROUS কার্বোনিফেরাস | | |
| | DEVONIAN ডিভোনিয়ান | | |
| | SILURIAN সিল্যুরিয়ান | | |
| | CAMBRIAN ক্যামব্রিয়ান | | |
| PRE-CAMBRIAN প্রাক্-ক্যামব্রিয় যুগ | | | ৫৭·৩ |

# গ্রন্থপঞ্জী


উইলকক্স, উইলিয়াম ( ১৯৩০ ) : Lectures on the ancient system of irrigation in Bengal and its application to modern problems. University of Calcutta, Calcutta.

কোলম্যান, জে, এম ( ১৯৬৯ ) : Brahmaputra river—Channel processes and sedimentation. Sedimentary Geology, special issue v. 3, p. 129—239.

গুপ্ত, জি, পি ( ১৯৭৭ ) : An appraisal of the sedimentation problem in the country and measures to combat it. Symposium on silting of reservoirs. Publication no. 126, Central Board of Irrigation and Power, New Delhi, p. 1—9.

ঘোষ, এইচ, পি ( ১৯৭২ ) : History, development and problems of dredging in the river Hooghly (*in* Bagchi, K and others, editors. p. 174—189).

ঘোষ, চন্দ্রশেখর ( ১৩৫৫ ) : দামোদর পরিকল্পনা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ৬৯, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

চক্রবর্তী, সত্যেশচন্দ্র ( ১৯৬৫ ) : পশ্চিমবঙ্গ পরিচিতি, অমৃত (পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা) পঞ্চম বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩৩শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭৫-৫৮০।

চক্রবর্তী, এ, কে, ও সেন, এ ( ১৯৭২ ) : Sediment transport characteristics in the Hooghly and the effects of upland disaharge, (*in* Bagchi, K), and others, editors), p. 89—100).

চ্যাটার্জী, পি, কে ( ১৯৭২ ) : Salinity intrusions in the Hooghly estuary ( *in* Bagchi, K., and others, editors, p. 143—153).

বসু, সুভাষরঞ্জন (১৯৬৭) ঃ Fundamental problems of meander formation, with special reference to the Bhagirathi river. Indian Journal of Power and River Valley Development, February 1967, p. 15—23.

বসু, সুভাষরঞ্জন ও কর, নিশীথরঞ্জন ( ১৯৭০ ) ঃ Meandering, migration and alluvial terraces in the Lower Bhagirathi valley, West Bengal, India. Indian Journal of Power and River Valley Development, January, 1970, p. 29—40.

বাগচী, কানন গোপাল, মুন্সী, এস, কে ও ভট্টাচার্য, আর ( ১৯৭২ ) ঃ The Bhagirathi—Hooghly Basin (Proceedings of the interdisciplinary symposium). The Calcutta University, Calcutta.

বোস, এন, কে ( ১৯৭২ ) ঃ The Bhagirathi—Hooghly—A few remarks (*in* Bagchi, K. G., and others, editors, 1972, p. xii—vviii).

বোস, এন, কে ও সিংহ, এ, কে ( ১৯৬৪ ) ঃ 1959 October flood of Damodar River. Indian Journal of Power and River Valley Development, August, 1964.

ব্যানার্জী, বি এন ( ১৯৭২ ) ঃ Navigation in a tidal river with particular reference to river Hooghly (*in* Bagchi and others, editors, 1972, p. 154—167).

ভট্টাচার্য্য, কপিল ( ১৯৫৯ ) ঃ বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা ( দ্বিতীয় সংস্করণ ), বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ।

ভট্টাচার্য্য, কপিল ( ১৯৭৮ ) ঃ কলকাতা-হলদিয়া বন্দর ও ফারাক্কা প্রকল্প, বারোমাস, আগষ্ট, ১৯৭৮, পৃঃ ২৯—৩৪ ।

মজুমদার, এস, সি ( ১৯৪২ ) : Rivers of the Bengal delta. Calcutta University Readership Lectures, The University of Calcutta, Calcutta.

মুখার্জী, দেবেশ ( ১৯৭২ ) : The Farakka Project. The Statesman, Calcutta, June 15 and 16, 1972.

মুখার্জী, দেবেশ ( ১৯৭৮ ) : পশ্চিমবঙ্গে বন্যা—বিশেষজ্ঞদের মতামত, বারোমাস, নভেম্বর ১৯৭৮, বিশেষ ক্রোড়পত্র, পৃঃ ৭৪।

মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ ( ১৯৪৮—৪৯ ) : পিয়ালী-বিদ্যাধরী অঞ্চল ও বন্যা সমস্যা, ভূ-বিদ্যা, জিওলজিকাল ইন্সটিটিউট, প্রেসিডেন্সি কলেজ ; ভলিয়ুম ১১, নং ১, পৃঃ ৩২—৪০।

মুন্সী, সুনীল ( ১৯৮০ ) : The disappearing Ganga. The Statesman, Calcutta, 1, September, 1980.

রায়, নীহাররঞ্জন ( ১৩৫৪ ) : বাংলার নদনদী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ৬৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।

সাহা, মেঘনাদ ( ১৯৩৮ ) : The problem of Indian rivers, Presidential address to the National Institute of Sciences of India, Proceedings of the National Institute of Sciences of India, v. IV, no. 1, p. 23—51.

সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় ( ১৯৬৬ ) : Geological and geophysical studies in western part of Bengal basin, India, Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, v. 50, no. 5, p. 1001—1017.

সেনগুপ্ত, সুপ্রিয় ( ১৯৭২ ) : Geological framework of the Bhagirathi—Hooghly basin (*in* Bagchi and others, editors, p. 3—8).

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা ঃ ২৭

নদীবাহিত পলল ও পাললিক শিলা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ডঃ সুপ্রিয় সেনগুপ্ত বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত। ভূবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ সেনগুপ্ত এ বিষয়ে কলকাতা ছাড়াও ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন।

নদী রচনাটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক নদীর আকৃতি, প্রকৃতি ও জীবনধারা সংক্রান্ত মূল তত্ত্বগুলি পরিবেষন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদী ও তাদের সমস্যা। প্রথম অধ্যায়ের আলোচিত তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতেই এসব সমস্যার বিচার করা হয়েছে। নদী শাসনের ফলে ভাগীরথী-হুগলী ও দামোদর উপত্যকার অধিবাসীরা কি ধরনের সুবিধা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

জীবন্ত প্রাণীদেহের মতই নদীপ্রবাহের সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরাজ করে। সে ভারসাম্য ব্যাহত হলে সমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার তাড়নায় নদী সংহার মূর্তিতে দেখা দেয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্যে হস্তক্ষেপ না করে কিভাবে মানুষ নদীর সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে, লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন উপসংহারে।

আগ্রহী পাঠকদের জন্য পরিশিষ্টে জলবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান সূত্রগুলিও সন্নিবেশিত হয়েছে।

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা